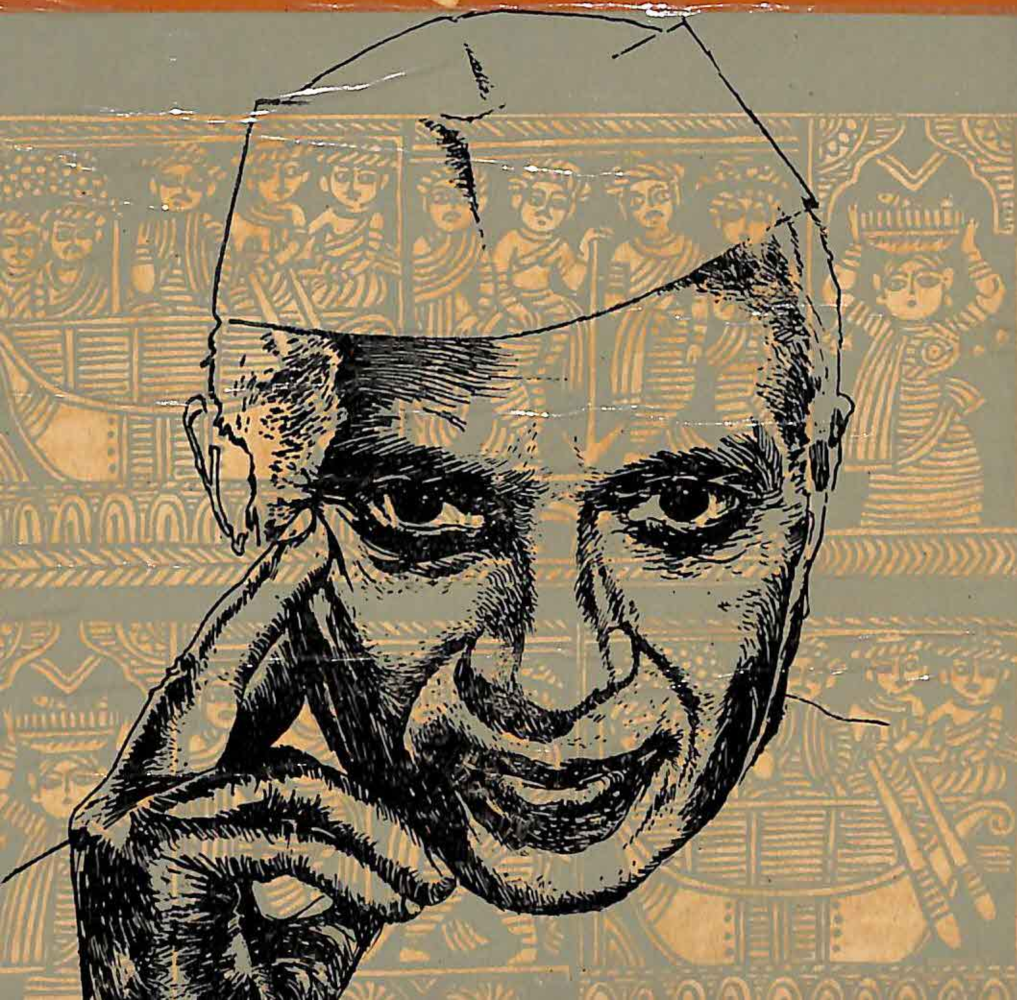
ভারতরত্ন

জওহরলাল



ভারতরত্ন জওহরলাল

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর : ১৯৬৭

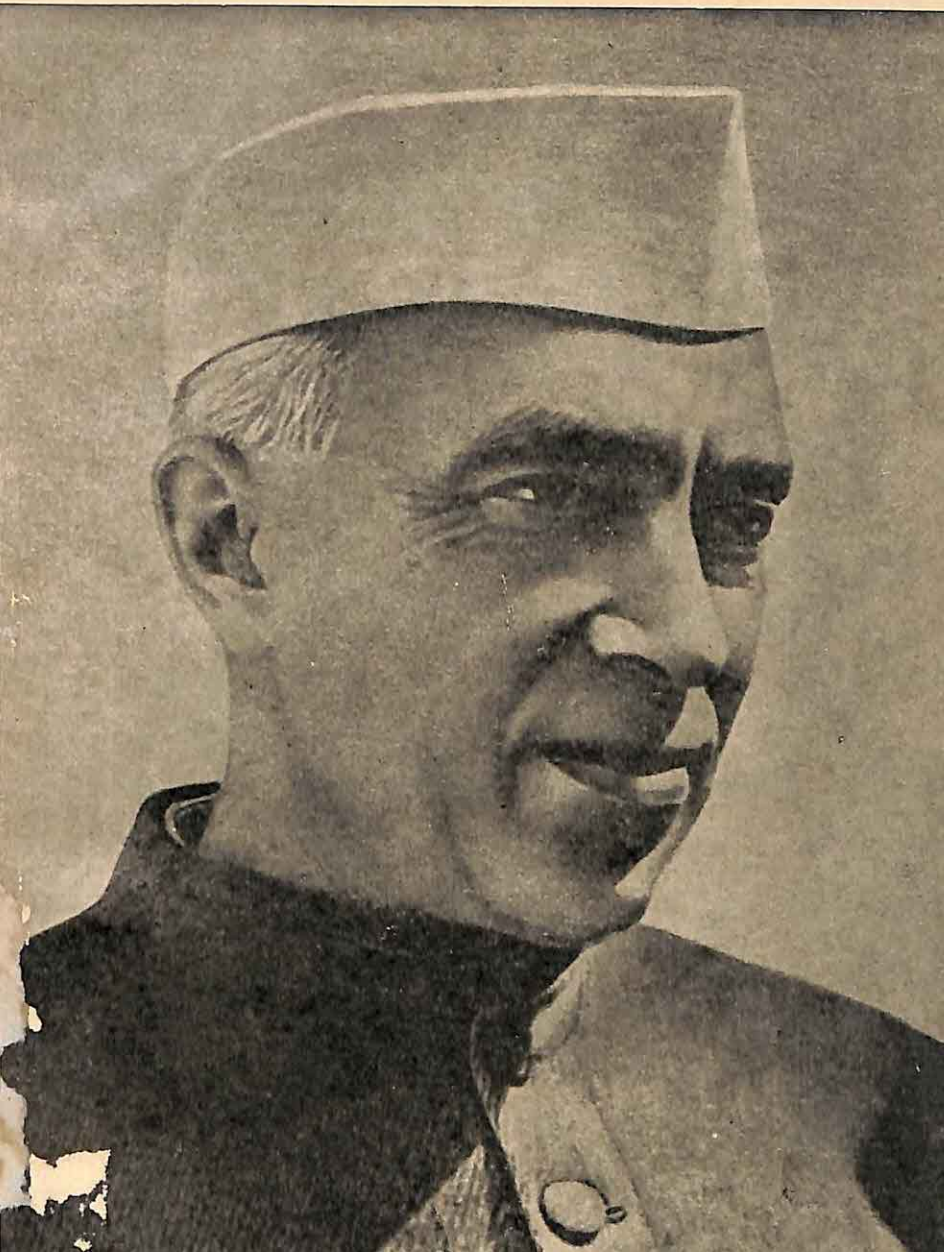
নূতন সংস্করণ, জানুয়ারি : ১৯৮৬

দাম : দশ টাকা মাত্র

শিল্পী

শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও ১৫ এ ক্ষুদিরাম বোস রোড কলিকাতা ৬
সাধারণ প্রেস হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত



স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্পর্কে বাংলা ভাষায় দু'একটির বেশী বই লেখা হয়নি। বিশেষ ক'রে যারা কিশোর, যারা তরুণ, তাদের সঙ্গে এই মহান্ নেতার জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেবার মত বই নেই বললেই চলে।

ভারত আজ অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যার অকূল পাথার পাড়ি দিয়ে আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে পণ্ডিতজীর অপূর্ব জীবন-কাহিনী ধ্রুবতারার মতই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেজন্যই তাঁর জীবনের বিচিত্র দিক্গুলির আলোচনা করবার এই প্রয়াস করেছি। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের এই পুরোহিতের, এবং স্বাধীন ভারতে নবযুগ সূচনার এই পথিকৃতের কাহিনী যদি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দেশপ্রেমে এবং নবভারত-গঠনে উদ্বুদ্ধ করে, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

বিষয়-সূচী

নেহেরু পরিবার	...	৭
জওহরলালের ছোটবেলা	...	১১
মেধাবী জওহরলাল	...	১৭
সৈনিক জওহরলাল	...	২১
নির্ভীক জওহরলাল	...	২৮
কাছের মানুষ জওহরলাল	...	৩৪
বিজয়ী জওহরলাল	...	৪৩
স্বাধীনতাযুদ্ধে জওহরলাল	...	৫৩
রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল	...	৯৬
মহাপ্রয়াণে জওহরলাল	...	১০৯
জওহরলালের জীবন-পঞ্জী	...	১১৫



নেহেরু পরিবার

বাংলা দেশের ঠাকুর পরিবারের মতই উত্তরপ্রদেশের নেহেরু পরিবারের দান ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। শিক্ষা-দীক্ষা, আভিজাত্য, স্বদেশ-সেবায় এই দুই পরিবার অনেক ক্ষেত্রে তুলনীয়। মুক্তিপথযাত্রায় নেহেরুদের বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনী আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। যেদিন বিখ্যাত আইনজীবী পণ্ডিত মতিলাল

তাঁর অতুল ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা ক'রে আমাদেরই দেশবন্ধুর মত দেশসেবার পথে এগিয়ে এলেন—সেদিন থেকে সারা জগতের বিস্মিত দৃষ্টি এই পরিবারটির ওপর আকৃষ্ট হ'ল। বিলাতী-কেতাদুরস্ত এঁদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন দেশের জনগণের ওপর অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করল।

সাধারণতঃ দেখা যায়, পিতার প্রতিভা পুত্রের মধ্যে বিকশিত হয় না। কিন্তু জওহরলাল এর অসাধারণ ব্যতিক্রম। পুত্রের যশ পিতার খ্যাতিকেও ছাপিয়ে গেল। সংস্কৃতে আছে, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ অর্থাৎ পুত্র এবং শিষ্যের কাছে পরাজয় গৌরবের ব্যাপার। মতিলাল এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। পুত্রই একদিন পিতাকে কঠোর সংগ্রামের নির্মম রণক্ষেত্রে টেনে এনেছিলেন। পিতা দাবী করেছিলেন ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাস। পুত্র দাবী করেছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। পুত্রের এই দাবীকেই পিতা স্বীকার ক'রে নিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পিতা, পুত্র এবং পৌত্রী তিনজনেই নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন—এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মতিলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর বিখ্যাত পিতা ও ভ্রাতার মতোই ভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন। কনিষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণা হাথীসিংয়ের দানও কম নয়। পৌত্রী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী। মতিলালের পত্নী বিদুষী না হ'লেও স্বদেশপ্রাণতায় ও তেজস্বিতায় সকলের অগ্রগণ্যা ছিলেন। তিনি পুলিসের লাঠির আঘাতকে হাসিমুখে সহ্য করতে, কারাবরণ করতে, দ্বিধা করেন নি। পরমা সুন্দরী কোমলস্বভাবা এই রমণীর মধ্যে অগ্নিগর্ভ আত্মার সন্ধান পাওয়া যেত। কথায় বলে, এমন মা না হ'লে এমন ছেলে হয়? পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর মনীষী পিতা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মাতার সাহচর্য লাভ ক'রে ধন্য হয়েছিলেন।

নেহেরু পরিবারের আদি নামটি কিন্তু ছিল 'কাউল'— যেমন ঠাকুর পরিবারের আদি নাম ছিল কুশারী। পরে এই কাউল পরিবারটি নেহেরু নামেই পরিচিত হয় এবং একদিন বিশ্বময় সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

নেহেরু পদবিটি নাহার শব্দ থেকে এসেছে। উর্দুতে 'নাহার' মানে নালা। এই বংশের পূর্বপুরুষরা নালার ধারে একটি বাড়িতে থাকতেন ব'লে এই নাম। উত্তর-প্রদেশ এঁদের আদি বাসস্থান নয়। এঁরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। রূপলাবণ্য, আভিজাত্য এবং পাণ্ডিত্যের জন্য নেহেরুরা সমধিক প্রসিদ্ধ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পরিবারের একটি মেয়েকে ইংরেজ সৈনিকরা একবার কোন অপহৃতা ইংরেজ-কন্যা ব'লে ভুল করেছিল। মেয়েটির গায়ের রং ছিল এমন ফর্সা!

নেহেরু পরিবারের মধ্যে আইনজীবীর সংখ্যাই বেশী। মতিলালের অগ্রজ নন্দলাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইনব্যবসায়ী ছিলেন। আর মতিলালের জোড়া উকিল ত সারা ভারতে পাওয়া দুষ্কর ছিল। ওকালতি ক'রে এত টাকা উপার্জন আর কেউ করেন নি। জওহরলালও ছিলেন ব্যারিস্টার। তাঁর কর্মজীবনের সূচনা বেশির ভাগ ভারতীয় নেতাদের মতই আইন-ব্যবসায়কে উপলক্ষ ক'রে।

য়ুরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সুসামঞ্জস্য ঘটেছে এই পরিবারের জীবনধারায়। মতিলাল ও জওহরলালের প্রভাবে এই পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই জাতীয়তা-মন্ত্রে দীক্ষিত। জওহর-কন্যা ইন্দিরা বা বিজয়লক্ষ্মীর মেয়েরা কেউই দেশের সেবায় কারাবরণ করতে দ্বিধা করেন নি। একান্তভাবে ভারতীয় হয়েও সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া কেমন ক'রে সম্ভব, তা এই নেহেরু পরিবারকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। আগামী কালের ইতিহাসে এঁদের পরিচয় হয়ত আরও স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকবে।



জওহরলালের ছোটবেলা

ইংরেজীতে যাকে বলে রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো, জওহরলালেরও হয়েছিল ঠিক তাই। প্রচুর ঐশ্বর্য আর বিলাসের মধ্যে জন্মেছিলেন জওহরলাল। সাধারণতঃ বড়লোকের ছেলেরা অত্যধিক আদরে অপদার্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কঠোর নিয়মতান্ত্রিক পিতার শাসনে সেই দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটে নি। মাতার আদর পেলেও

বাল্যকালে জওহরের সৎশিক্ষার অভাব হয় নি। মার মুখে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী তিনি রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনতেন। সেই বীরত্ব-গাথাগুলি চিরদিনের মত তাঁর হৃদয়পটে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের বাড়িতে মুন্সী মবারক আলি ব'লে একজন থাকতেন। তাঁর মুখ থেকে সিপাহী-বিদ্রোহের গল্প, আরব্যরজনীর রূপকথা প্রভৃতি শুনে কিশোর জওহরের চিত্ত উদ্দীপিত হয়ে উঠত। নিজেকে নায়ক কল্পনা ক'রে তিনি দুঃসাহসিকের জয়যাত্রার স্বপ্নে মেতে উঠতেন। অসমসাহসী জওহরলালের মন শিশুকাল থেকেই বিচিত্র রসে ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

জওহরলালের পড়াশোনার জন্য পণ্ডিত মতিলাল মেমসাহেব নিযুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া অনেক ইংরেজ রাজকর্মচারীই ছিলেন তাঁর বন্ধু। ফলে এই বালকের মনে ইংরেজপ্রীতি জন্মানো আশ্চর্য নয়। কিন্তু দেশের চারদিকে তখন ইংরেজবিদ্বেষ ফুটে উঠতে সুরু করেছে। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজের দুর্ব্যবহার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। পার্কে পর্যন্ত এদেশের লোকের ইংরেজদের সঙ্গে বেড়ানোর স্বাধীনতা নেই। রেলে তাদের কামরায় ঢুকলে অপমানের চূড়ান্ত। এইসব অমানুষিক ব্যবহার বালক জওহরলালের মনকে তিক্ত, এমন কি ক্ষিপ্ত, ক'রে তুলেছিল। তাই যখন তিনি শুনতেন, কোনো ভারতীয় ইংরেজের অপমানের পাল্‌টা জবাব দিতে পেরেছে তখনই

তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে উঠত—গৌরবে ভরে উঠত বুক। তাঁর এক আত্মীয় সাহেব-ঠেঙানোর কাজে খুব পটু ছিলেন। কাজে কাজেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জওহরলালের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তবু ইংরেজ-চরিত্রের নানা গুণের দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাই তিনি তাদের ভাল গুণগুলির অধিকারী হ'তে পেরেছিলেন। জওহরলাল বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা, তেজস্বিতা, উদার পাণ্ডিত্য, কর্ম-ক্ষমতা—বহু বিষয়েই হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় হয়েও বিদেশীদের শ্রদ্ধার পাত্র।

ছোট বয়সে বড়দের মতই গম্ভীর ছিলেন জওহরলাল। বড়রা যা আলোচনা করতেন, যে বই পড়তেন, সেইগুলির দিকে ছিল তাঁর ঝোঁক। পণ্ডিত মতিলালের বৈঠকখানায় দেশের গণ্যমান্যরা এসে জুটতেন। বালক জওহরলাল আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে সেইসব কথাবার্তা শুনতেন। একবার এক মজার ব্যাপার ঘটে। মতিলাল লাল রং-এর একরকম মদ খাচ্ছিলেন। বালক জওহরলাল ছুটে এসে মাকে জানিয়ে দিলেন, বাবা রক্ত খাচ্ছেন। তারপর আসল ব্যাপার জানতে পেরে তাঁর ভয় ভাঙে।

রাশভারি পিতার কাছে যেতে ভরসা পেতেন না জওহরলাল। যা কিছু আবদার ছিল মার কাছে। পণ্ডিত মতিলালের বকুনিকে জওহরলাল কেন, শহরসুদ্ধ লোক ভয় করত। মতিলালের রাগ ছিল সাংঘাতিক। জওহরলালের

মত ভাল ছেলেকেও যে কত বকুনি আর কত প্রহার খেতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। একবার তিনি বাবার এক ফাউণ্টেন পেন চুরি ক'রে ধরা পড়ে যান। জওহর ভেবেছিলেন, বাবার অতগুলি কলমের কি দরকার, একটা নিলে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু মতিলালের হাতে বেদম প্রহার খেয়ে তাঁর সে ভুল ভাঙে। বহুদিন তাঁর গায়ের ব্যথা মরে নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মালিশ লাগিয়ে তবে সে ব্যথা সারে।

তবে ছেলের দুরন্তপনাকে মতিলাল চিরদিনই প্রশ্রয় দিতেন। একবার জওহর দুষ্টুমি করতে গিয়ে শুধু যে বেঁচে যান তা নয়, বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ আদর-আপ্যায়নে তাঁকে তুষ্ট করা হয়। জওহরলালের বয়স তখন সাত-আট বছর। তিনি সবে ঘোড়ায় চড়তে শিখেছেন। একদিন আস্তাবলে গিয়ে দেখেন, বাবার আরবী ঘোড়াটা লাগামসুদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আশেপাশে কেউ নেই। এ লোভ কি আর সামলানো যায়! জওহরলাল প্রাণের আনন্দে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটি খালি পিঠে বাড়িতে ফিরে এলো। অপটু বালক সওয়ার তখন ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এদিকে ঘোড়াকে একা ফিরতে দেখে বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ধুলোমাখা গায়ে বালক জওহরলাল ফিরে এলেন—তখন মনে হ'ল, তিনি যেন ওয়াটার্লু জয় ক'রে ফিরছেন।

পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন নিজে পালোয়ান। তিনি যৌবনে প্রায়ই পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতেন। তাঁর যৌবনের গোঁফজোড়া দেখলে তাঁকে কোন বড় জেনারেল মনে হ'ত। জওহরলাল যখন বিলেতে থাকতেন, তখন তাঁর বাবা তাঁকে প্রায়ই দুরন্তপনায় উৎসাহ দিতেন। একবার চিঠিতে লিখেছিলেন, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে রীতিমত মারপিঠ হচ্ছে না জেনে হতাশ হয়েছি।

আবার এই পিতারই কোমল অন্তরের পরিচয় পেয়ে আমরা অবাক হয়ে যাই। যখন জওহরলাল প্রথম জেলে গেলেন—পণ্ডিত মতিলালের সে কি দুশ্চিন্তা! ধনী অভিজাতের আদরের দুলাল জওহরলাল—সে কেমন ক'রে জেলখানায় মাটির শয্যায় শোবে? স্নেহাতুর বাপ দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা ছেড়ে নিজের ঘরের মাটিতে শুয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন, কঠিন শয্যায় কতখানি কষ্ট হয়। কোমলে-কঠোরে মেশানো এই স্বভাব পুত্রও পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন।

পণ্ডিত মতিলালকে জওহরলাল যতখানি ভয় করতেন, শ্রদ্ধাও তার চেয়ে করতেন অনেক বেশি। পিতার আদর্শকে সামনে রেখে তিনি জীবনপথে পা বাড়িয়েছিলেন। পরে অবশ্য কিছু কিছু আদর্শগত তফাত ঘটেছিল, কিন্তু পিতার দৃঢ়চরিত্রের প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা কোনোদিন হ্রাস পায় নি।

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে পিতার গুণকাহিনী পরম শ্লাঘার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিশোর জওহরের জন্মদিনের উৎসব খুব ঘটা ক'রে সম্পন্ন হ'ত। উপহার আর ভোজের ছড়াছড়ি। এমন দিনটি কার না ভাল লাগে বল? তাই জওহর ঠিক করলেন, বছরে শুধু একটি বারই 'জন্মদিন' আসবে, তা হবে না—বার বার আসা চাই, আনন্দের ধুম পড়বে একবার নয়, দু'বার নয়—অন্ততঃ কয়েকবার। এই প্রস্তাব নিয়ে একটা আন্দোলন চালালে কেমন হয়? জওহরের জন্মদিনের আর একটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁকে দাঁড়িপাল্লার একদিকে বসিয়ে অন্য দিকে ময়দা প্রভৃতি খাবার জিনিস চাপানো হ'ত। আর সেগুলি বিলিয়ে দেওয়া হ'ত গরীব-দুঃখীদের। আনন্দের সঙ্গে সেবার সুযোগও থাকত জন্মদিনের মধ্যে। জওহরলাল মজা ক'রে লিখেছেন, ভবিষ্যৎ-জীবনে কিন্তু জন্মদিনগুলি আর সেই রকম আনন্দের বার্তা বয়ে আনে নি; কারণ তখন মনে হয়েছে —একটি ক'রে জন্মদিন আসচে আর একবছর ক'রে বয়স বেড়ে বুড়োর দলে গিয়ে পড়চি।' কিন্তু চির-তরুণ জওহরলাল কি কোনোদিন সত্যি সত্যি বুড়ো হয়েছিলেন? ৭৪ বছর বয়সেও ১৪ই নভেম্বর তারিখে জওহরলাল তাঁর জন্মদিনে বিশ্বের কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছিলেন—তারুণ্যের প্রতীক রূপেই।



মেধাবী জওহরলাল

ছোট বয়স থেকেই জওহরলালের লেখাপড়ার দিকে ছিল ভারী ঝোঁক। বাবার বড় লাইব্রেরি তাঁর কিশোর মনে অফুরন্ত প্রেরণা যোগাত। তা ছাড়া আইরিশ শিক্ষক ব্রুক্স্ও তাঁর ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁকের জন্য দায়ী। অল্পবয়সে থিওসফিস্টদের সঙ্গে মিশে ধর্ম সম্বন্ধেও জওহরলাল কিছু কিছু বই পড়েছিলেন—কিন্তু সে

কৌতূহল বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। তেরো বছর বয়সে "থিওসফিক সোসাইটির" সভ্য হয়ে তিনি বাবা এবং আর সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন।

পণ্ডিত মতিলাল ছেলের জন্য বাড়িতেই একটি ল্যাবরেটরি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। বালক জওহরলাল সেইখানে বসে নানারকম পরীক্ষা করতেন আর ভবিষ্যতে মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক হবেন—এই স্বপ্ন দেখতেন। বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক সারাজীবন তাঁর সমানভাবেই বর্তমান ছিল। নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিও তিনি হয়েছিলেন। ভারতের কৃষিতে ও শিল্পায়নে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। তাই দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে তিনি বিজ্ঞানকে এমন উঁচুতে স্থান দিয়েছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই জওহরলাল ইংরেজী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী লিখিয়েদের মধ্যে তিনি একজন ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর "আত্মজীবনী" ও "ভারত আবিষ্কার" প্রভৃতি বইগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর পেয়েছে। ইংরেজী কাব্য আর ভ্রমণ-কাহিনীরও তিনি ছিলেন একাগ্র পাঠক। রেলের কামরায়, মোটর-গাড়িতে সর্বত্র তাঁর সঙ্গে বই থাকত। নানা বিষয়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। এত কর্মবহুল জীবনেও তিনি এই পড়ার অবসর খুঁজে বের ক'রে নিতেন।

জওহরলালের ইতিহাসের জ্ঞানও ছিল অতুলনীয়। জেল থেকে মেয়ে ইন্দিরাকে লেখা চিঠিগুলি সারা বিশ্বের সম্পদ্। Glimpses of World History (বিশ্ব-ইতিহাস) নামে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এমন সরল সুন্দর ভাষায় জগতের ইতিহাস আর কেউ লেখেন নি। তা ছাড়া ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে পরাধীন দেশের বেদনাতুর কাহিনী আর স্বাধীন জাতির গৌরবোজ্জ্বল অমর ইতিকথা। জেলের মধ্যে ক'খানা বই-ই বা হাতের কাছে পাওয়া যায়! সেখানে ব'সে এই অতুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ সৃষ্টি কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়।

তোমরা সবাই জান, পণ্ডিত জওহরলাল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তা ছাড়া তিনি ছিলেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী-ও। সারা জগতের ইতিহাস ও রাজনীতি যাঁর নখদর্পণে, তিনিই এই পদের যোগ্য ব্যক্তি। জওহরলাল খুব কম সময়ের মধ্যেই এই বিভাগে যে কর্মদক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তাতে সারা জগৎ বিস্মিত হয়েছিল। তিনি প্রায় সতের বৎসর স্বাধীন ভারতের কর্ণধার ছিলেন। ভারতকে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমকক্ষ ক'রে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

জওহরলাল ছিলেন সমাজবাদে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় সম্পদে দেশের প্রতিটি মানুষের সমান

অধিকার। যে দেশের ধনী আরও ধনী হয়, এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়, সে দেশের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। তাই রাশিয়ার সোভিয়েট বিপ্লবকে তিনি যুগান্তকারী ঘটনা ব'লে মনে করতেন। তাঁর কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয়েছিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসরই রুশদেশে সোভিয়েট বিপ্লব হয়েছিল। একখানি পত্রে পরে তিনি তাঁর কন্যাকে লিখেছিলেন, 'তুমি সৌভাগ্যবতী, কারণ যে বৎসরে সোভিয়েট বিপ্লব হয়েছে, সেই বৎসরেই তুমি জন্ম লাভ করেছ।' জওহরলাল মার্ক্‌স্‌বাদী ছিলেন না, কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। মার্ক্‌স্‌বাদের লক্ষ্যকে —সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে—তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন। কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদে যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে, তাতে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংসার পথকেই একমাত্র পথ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পথ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, অহিংসার পথেই ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। সমাজবাদী চিন্তাধারা ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে তাঁকে অক্লান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। তাই অনেকের মতে, তিনি বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়ক।



সৈনিক জওহরলাল

যখন রুশ-জাপানের যুদ্ধ বাধে, তখন জওহরলাল ছেলে-মানুষ। তবু কাগজে সেইসব খবর পড়ে তাঁর কিশোর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। জাপানীরা এশিয়াবাসী হয়েও দুর্ধর্ষ রুশদের হারিয়ে দিয়েছে, এই সংবাদ শুধু বালক জওহরলাল কেন, সারা ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছিল। পরাধান জাতির অন্তরে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে

এসেছিল। চৌদ্দ বছরের জওহরলাল কল্পনা করতেন, তিনিও অস্ত্র-হাতে যেন চলেছেন বিজয়ী সৈনিকের মত ; রণক্ষেত্রের দুন্দুভিনিনাদ তাঁর রক্তকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। মুক্তি-সংগ্রামে সৈনিক হবার সাধ তাঁর তখন থেকেই।

তারপর বিলাতে শিক্ষালাভের সময় তিনি ইতালীয় বীর গ্যারিবল্ডি সম্পর্কীয় কয়েকখানি বই প্রাইজ পান। সেই বইগুলি তাঁর মনের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ভাবতেন, গ্যারিবল্ডি যেমন ক'রে ইতালীয় জাতিকে সংঘবদ্ধ আর মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন—তিনিও একদিন তেমনি ক'রে ভারতকে গড়ে তুলবেন। এমনি ভাবে তরুণ জওহরলালের মনে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। বিলাতে পড়বার সময়ে তিনি সৈনিক সেজে কুচকাওয়াজ করতেন, বন্দুক চালাতেন। তখন তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ পিতা মতিলালকে লিখেছিলেন, তরুণ জওহরলালকে সামরিক পোশাকে খুবই সুন্দর দেখায়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি যে সৈনিকের পোশাক পরেছিলেন, তা ছিল খদ্দরের সাদা পায়জামা আর কোর্তা। যখন তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি, তখনও তাঁর ছিল ঐ পোশাক! তাঁর অস্ত্র ছিল দেশবাসীর ঐক্য ও শক্তি, তাঁর বর্ম ছিল দেশবাসীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন রক্ষণশীল দলভুক্ত। তখনও পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তাঁরা ভাবতে পারতেন না। কিন্তু

জওহরলাল বিলাতে বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লজপৎ রায় প্রভৃতির বক্তৃতা শুনে চরমপন্থীদের মত ভাবতে শুরু করেছিলেন। ইংরেজবিদ্বেষী কঠোর মনোভাব ধীরে ধীরে তাঁকে অধিকার করতে লাগল। এই মতভেদের জন্য পিতা-পুত্রে তর্ক-বিতর্কও কম হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত জওহরলাল কঠিন সংগ্রামের পথই বেছে নিলেন।

পরে তিনি লিখেছিলেন—আরামের আশ্রয় নয়, দুঃখের আঘাতই সত্যিকার মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলে। বিলাসলালিত জওহরলাল ভবিষ্যতে কি কঠিন পরিশ্রমক্ষম হ'তে পেরেছিলেন, তার পরিচয় পাই তাঁর নির্বাচন-সফরগুলির বর্ণনায়।

তিনি লিখেছেন, একটি নির্বাচনী সফরে চার মাসের মধ্যে তিনি চল্লিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন—এরোপ্লেনে, রেলে, মোটরে, লরীতে, ঘোড়ার গাড়িতে, গরুর গাড়িতে, সাইকেলে, নৌকোয়, ঘোড়া-হাতী-উটের পিঠে আর পায়ে হেঁটে। প্রতিদিন অন্ততঃ ১২টি সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন—সবসুদ্ধ প্রায় ১ কোটি লোক তা শুনেছিল। আর এই সূত্রে কয়েক লাখ লোকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল।

সৈনিক জওহরলাল তাঁর রাজনৈতিক জীবনে চাষী মজুর মধ্যবিত্ত সকলের প্রাণ স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। এই

শক্তির মূলে ছিল তাঁর নিরহংকার উদার মন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েও নিজেকে কংগ্রেসের সেবকমাত্র ভাবতেন। উত্তরপ্রদেশের চাষীরা জানত, তিনি তাদেরই একজন। তারা জানত, বিপদের দিনে তিনি যত দূরেই থাকুন, নিশ্চয়ই তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন!

হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ছিল তাঁর অনুরক্ত। মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে তাঁর চোখের সামনে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। বহু মুসলমান কায়েদে-আজম জিন্না সাহেবের চেয়ে জওহরলালকেই শ্রদ্ধা করতেন বেশী। তার পরিচয় পাওয়া যাবে বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে এই বিহারবাসী মুসলমানটির কথোপকথন থেকে—

প্রশ্ন—বিহারে পাহারার ব্যবস্থা কি কলকাতার চেয়ে ভাল?

উত্তর—নেহেরুজী বোঝাবার পর খুব ভাল কাজ হয়েছে। বিহারের যে কোনো জায়গায় গেলে বুঝতেন কি রকম কড়াকড়ি ব্যবস্থা। তার তুলনায় কলকাতায় কোনো সুব্যবস্থাই নেই। (কলকাতায় তখন মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা ছিল।)

প্রশ্ন—বিহারে ফিরে ত যাচ্ছেন! সেখানে গিয়ে কি উপায় হবে?

উত্তর—সেখানে কারু কিছু অসুবিধা নেই। নেহেরুজী আমাদের বলেছেন, সকলকেই সরকারী খরচায় বাড়িঘর

আবার তৈরী ক'রে দেবেন। কাজেই আমাদের ভাবনার কিছু নেই। এখন পর্যন্ত নেহেরুজী যা বলেছেন, তার সবই তো করা হয়েছে। তিনি যখন বলেছেন, তখন আমাদের একটা ভাল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে!

যদিও সীমান্তপ্রদেশ ভ্রমণের সময় বৃটিশের চক্রান্তে এবং মুসলিম লীগের প্ররোচনায় দুষ্টবুদ্ধি মুসলমানরা তাঁকে আঘাত করেছিল, তবু একথা সত্য যে, হাজার হাজার মুসলিম অন্তরে অন্তরে তাঁকে পরম বন্ধু ব'লে জানত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলমান নেতা সীমান্তপ্রদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব নেহেরুকে রক্ষা করবার জন্য নিজের জীবনও বিপন্ন করেছিলেন। ফলে তাঁর ওপর আঘাতও কম হয় নি। সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ ত জওহরলালকে ভাইয়ের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। এই সর্বজনমান্য সরলপ্রাণ মুসলমান নেতার জওহর-প্রীতি সম্বন্ধে কত গল্পই না প্রচলিত আছে! বিখ্যাত মুসলমান কবি ইক্‌বালও জওহরলালের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় পণ্ডিতজীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন।

একদিন সীমান্ত প্রদেশের বেশীর ভাগ মুসলমানই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক জওহরলালকে কি সম্মানই না দেখিয়েছেন! তাঁকে পেয়ে সীমান্তবাসীদের আনন্দ আর ধরত না। কারণ জওহরলালের চেষ্টাতেই

এখানকার উপজাতিগুলির উপর বৃটিশের বোমাবর্ষণ বন্ধ হয়েছিল। এই স্বাধীন খণ্ড-জাতিগুলির মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে জওহরলালও কম আনন্দ পান নি! ভারতের সঙ্গে তাদের সেই প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

নেতাজীর প্রেরণায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভবপর হয়েছিল ব'লেই এই সৈন্য-দল জওহরের এত প্রিয় ছিল। তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত একটি ব্রিগেড মণিপুরে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছিল। এদের বীরত্বের কাহিনী শুনে নেহেরু এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, লাল কেল্লায় শাহ্ নওয়াজ, ধীলন আর শেহ্গলের বিচার হবার সময় তিনি বহুকাল পরে ব্যারিস্টারের পোশাক প'রে তাঁদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। এঁদের মুক্তির ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা কম উল্লেখযোগ্য নয়!

সেনাদলের নিয়মানুবর্তিতা তাঁর চরিত্রে মজ্জাগত। তাঁর চাল-চলন, হাব-ভাব খাঁটি সৈনিকের মত। তাঁর বক্তৃতা শুনলে মনে হ'ত স্বাধীন দেশের কোনো সেনাপতির বক্তৃতা শুনছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তাঁর বজ্রকণ্ঠে যেদিন শুনেছিলাম—আপ্কা আঁখোকা সাম্‌নে বৃটিশ সাম্রাজ্ চূর চূর কর্‌কে গির পড়্তা হ্যয়—সে দিন মনে এক অপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল।

আর একদিনের কথা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে

আমরা কংগ্রেস অফিসে প্রশ্ন করেছিলাম, জাপান যদি আমাদের আক্রমণ করে, তবে আপনি কি করবেন? তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, সে ক্ষেত্রে আমি নিজে গেরিলা বাহিনী গড়ে জাপানকে প্রাণ দিয়ে রুখব! এই হ'ল খাঁটি সৈনিকের কথা। কোনো সংগ্রাম, কোনো সংঘর্ষকে তিনি ভয় করতেন না। স্বাধীনতার বেদীমূলে যাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁর এগিয়ে চলার পথে বাধা কোথায়? পর্বত-সমুদ্র, মৃত্যুভয়, নিষ্পেষণ তাঁর বিক্রমের সামনে পরাভূত হয়ে যেত।

পরে সৈনিক জওহরলাল আহ্বান পাঠিয়েছিলেন দেশের তরুণদের কাছে, মাতৃভূমির সেবায় সৈনিক হবার জন্যে। বৃটিশ ভারতীয় বাহিনী রূপান্তরিত হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীতে।

জওহরলাল অহিংসা ও শান্তির পূজারী ছিলেন। তবু দেশ রক্ষার জন্যে স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে তিনি ভারতীয় বাহিনীকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর ভূমিকাকে, দেশরক্ষায় জওয়ানদের আত্মদানকে, কখনও ছোট ক'রে দেখেন নি।



নির্ভীক জওহরলাল

নেপোলিয়নের মত জওহরলাল ভয় কাকে বলে কোনো দিনই জানতেন না। ঘোড়ায় চড়া, দুর্গম পথে যাত্রা, বিমানযোগে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম, পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পা বাড়ানো—ছোটবেলা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। কোনো বাধা পেলেই তিনি

চঞ্চল হয়ে উঠতেন, যতক্ষণ না তাকে জয় করতে পারতেন, ততক্ষণ তাঁর মনে শান্তি থাকত না। অপূর্ব সাহস আর আত্মত্যাগের পরিচয় তিনি জীবনের প্রতি পদে দিয়েছিলেন ব'লেই মহাত্মা গান্ধী তাঁকেই ভারতনায়ক রূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। মহাত্মার মতে, তিনিই ছিলেন ভারতের কর্ণধার হবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি।

পাহাড়ে চড়ার শখ জওহরলালের ছোটবেলা থেকেই। হিমালয়-অভিযানের গল্প প'ড়ে তাঁর আশ যেন আর মিটত না। তা ছাড়া ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের লোক হিসেবে পাহাড়ের প্রতি টান থাকা বোধহয় তাঁর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। তরুণ বয়সে কাশ্মীর থেকে এক সঙ্গীকে নিয়ে তিনি হিমালয়ের দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তিনি ১১,৫০০ ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন পায়ে হেঁটে। কখনও কখনও বরফ-পিছল পথে দড়ি ধ'রে ধ'রে তাঁকে উঠতে হয়েছিল। হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য, কাশ্মীরের পার্বত্যভূমি তাঁর মনকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই বিচিত্র কর্মের ফাঁকে তিনি কয়েক দিনের জন্য পাহাড়তলিতে বেড়িয়ে আসতেন; দুর্গম গহন কঠিন পথের আহ্বানকে এই নির্ভীক বীর কেমন ক'রে উপেক্ষা করবেন?

মৃত্যুর মুখোমুখি হাসিমুখে দাঁড়াবার আনন্দ তাঁর

আজন্ম। কেম্ব্রিজ কলেজ থেকে ট্রাইপস পেয়ে সবেমাত্র বেরিয়েছেন তিনি। তখন তাঁকে ডাক দিল ইউরোপের পাহাড়গুলি। তিনি নরোয়েতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক ইংরেজ বন্ধু। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে তাঁরা ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এলেন। ইচ্ছে হ'লো স্নান করবার। কিন্তু স্নানের কোনও ব্যবস্থাই নেই সেখানে। হোটেলের মালিক বলল, কাছেই একটা হিমবাহ আছে, তা থেকে প্রচণ্ড বেগে জল পড়ছে, ইচ্ছে করলে ওঁরা সেখানে স্নান ক'রে আসতে পারেন। তাতেই রাজি। দুই বন্ধু আনন্দে তৎক্ষণাৎ তোয়ালে নিয়ে চললেন স্নান করতে। জওহরলাল সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলে নামলেন। জল গভীর নয়, কিন্তু ঠাণ্ডায় হঠাৎ তাঁর পা দুটো জমাট হয়ে গেল। তিনি পিছলে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত দেহ যেন বরফ হয়ে গেল। উঠবার মত তাঁর শক্তি রইল না। জলের স্রোত তাঁকে দ্রুতবেগে টেনে নিয়ে চলল। সম্মুখেই গভীর খাত, এক নিমেষেই তিনি সেই খাতে আবর্তের মধ্যে তলিয়ে যেতেন—যদি না তাঁকে তাঁর ইংরেজ বন্ধুটি উপর থেকে তাঁর পায়ে ধ'রে টেনে তুলতেন।

যাঁকে মৃত্যুও কোনদিন ভয় দেখাতে পারে নি, তাঁর কাছে কারাদণ্ডের ভয় ত কিছুই নয়! প্রথমবার গ্রেপ্তারের সময়ও তিনি অবিচলিত ছিলেন।

কংগ্রেস-অফিসে বসে তিনি তখন কাজ করছেন। জওহরলাল খবর পেলেন, পুলিশ এসেছে, বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে। তিনি নির্ভীক ও স্থির চিত্তে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। পুলিশের লোকেরা তাঁর শান্ত ভাব দেখে অবাক হয়ে গেল। আর একবার পুলিশের দল তাঁর সামনে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা হাজির করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হেসে ব'লে উঠলেন—"বহুৎ দিনোঁ সে আপ্কা ইন্তাজার থা।" আপনাদেরই অপেক্ষা করছিলাম অনেকদিন থেকে।

স্যার সাফাৎ আমেদ খাঁকে বিরুদ্ধ দলীয় লোকেরা যখন ছুরিকাঘাত করল, বড়লাট তখন নেহেরু-প্রমুখ কংগ্রেস-নেতাদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র রক্ষীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু অসমসাহসী জওহরলাল এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তিনি অকুণ্ঠিতভাবে তাঁর কাজ ক'রে গেছেন, আততায়ীর অস্ত্র তাঁর কর্তব্য পালনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি। কয়েকবার তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রও ধরা পড়েছিল। কিন্তু এসব শুনে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নি।

সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিদের মধ্যে গেলে তাঁর প্রাণ-সংশয় হ'তে পারে ভেবে অনেকেই জওহরলালকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অচল অটল। একবার যা করবেন ঠিক করেছেন, মাথায় বজ্রাঘাত হ'লেও তা তিনি করবেনই। লোকের ভয় অমূলক ছিল না।

কুচক্রীর নির্দেশে গুণ্ডার দল সর্বজনমান্য নেতার অঙ্গে নিষ্ঠুর আঘাত হানল। রক্তধারা গড়িয়ে পড়ল তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল বেয়ে। তবু অজেয় বীর বন্ধ করলেন না তাঁর সংকল্পিত দুর্গম পথযাত্রা। কোনো রকম আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না রেখে তিনি বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তাঁর সাহস দেখে দুর্ধর্ষ পাঠান-আফ্রিদিরাও মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল। মৃত্যুপণ ক'রে তিনি এই স্বাধীন দেশের লোকদের হাতে বন্ধুত্বের রাখী বেঁধে এলেন।

কাশ্মীর রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ সুরু করেছে। তারা আর অপমান অত্যাচার সইবে না। কাশ্মীরের বাঘ শেখ আবদুল্লা তাদের নেতা। জওহরলালের প্রাণে পোঁছল এই ডাক। তিনি ছুটে গেলেন তাঁর প্রিয় স্বদেশে, অত্যাচারীর উদ্যত খড়্গকে রুখবার জন্য। কাশ্মীর সরকার তাঁর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। কাশ্মীর পুলিশ তাঁকে আঘাত করল। কিন্তু সকল বাধা চূর্ণ ক'রে এগিয়ে চললেন জওহরলাল। দেশীয় রাজ্যের পুলিশ সভয়ে পথ ছেড়ে দিল। যাঁর কাশ্মীর প্রবেশের অনুমতি ছিল না—তিনি তার কেন্দ্রস্থলে পোঁছে মুক্তির বাণী দিয়ে এলেন জাগ্রত জনগণকে। অত্যাচারীর শাসন-দণ্ড নিষ্ফল হয়ে গেল।

বিহারে হিন্দু-মুস্‌লিম দাঙ্গার সময় হিন্দুদের ডেকে

পণ্ডিতজী বললেন, তোমরা আগে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবে, তারপর একজন মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারবে। মুসলমান নেতাদের কথা দূরে থাক্‌, ক'জন হিন্দুনেতার মুখেই বা এমন নির্ভীক, এমন উদার বাণী শোনা যায় ?

হে বিপ্লবের অগ্রদূত ! আমরা তোমায় প্রণাম করি। তোমার মত অচঞ্চল নিষ্কম্প হৃদয়ে যেন আমরা দেশমাতৃকার সেবা ক'রে ধন্য হই ! আমাদের সামনে বিপদসংকুল পথ, পিছনে শত্রুর উদ্যত অস্ত্র—আমাদের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত কর ! হে বিজয়ী বীর ! নবজীবনের প্রাতে আমরা তোমার অক্ষয় আদর্শের ধ্বজা বহন ক'রে সত্যের পথে, ত্যাগের ও মুক্তির তীর্থ-যাত্রার পথে অগ্রসর হই ! তোমাকে আমরা পুরোধারূপে পেয়েছিলাম, এই আমাদের গর্ব। হে নির্ভীক নেতা, ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেনাপতি, নব ভারতের নির্মাতা ! তোমার অমর আত্মা আমাদের প্রেরণা দিক্‌ ! আমরা সমবেত কণ্ঠে দিগ্বিদিক আলোড়িত ক'রে উচ্চারণ করি—"জয় হিন্দ্‌ ! জয় ভারতমাতার জয় !"



কাছের মানুষ জওহরলাল

যে মানুষটির যশ জগৎজোড়া, যাঁর কাঁধে ভারতবর্ষের শত সমস্যার গুরুভার চাপানো ছিল, তাঁকে কাছ থেকে দেখলে আশ্চর্য লাগত—কত সহজ মানুষ, কী আমুদে আর কতখানি উদারপ্রাণ! কঠিন কর্মের অবসরে জওহরলাল যখন ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধূলো করতেন, তখন ভাবতেই পারা যায় না, একটু আগে এই মানুষের

বজ্রহুংকারে সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যও কেঁপে উঠেছিল। ছোটরাও তাঁকে চমৎকার খেলার সঙ্গী ব'লেই জানত। পণ্ডিতজীর মত ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, দৌড়ঝাঁপ করতে ক'জন ওস্তাদ ছিল? চুল পাকলে কী হবে, মনটি ছিল তাঁর চিরসবুজ।

গল্পের ছলে তিনি ছোটদের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এমন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতেন যে, তারা সেই শিক্ষা কখনো ভুলত না। নানাদেশে বেড়িয়েছেন জওহরলাল। সেই সব গল্প শোনবার জন্য তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়েরা ব্যাকুল হয়ে থাকত। বিজয়লক্ষ্মীর মেয়েরা ছিল মামাজীর ভারী ভক্ত। তাঁর আদর্শেই তারা অনুপ্রাণিত। এমন কি পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে পণ্ডিতজী যেমন অচঞ্চল থাকেন—চন্দ্রলেখা, নয়নতারা, এরাও তাঁর সেই স্বভাব নকল করতে পেরেছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের কী ভাবে মানুষ করতে হয় পণ্ডিত জওহরলাল তা খুব সুন্দর ভাবেই জানতেন। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগের পর কন্যা ইন্দিরাকে মানুষ ক'রে তোলবার ভার তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। সেই আদর্শে শিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই ইন্দিরা আগস্ট-আন্দোলনের সময় এলাহাবাদে পুলিশের গুলিকে তুচ্ছ ক'রে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, আর আজ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

জওহরলাল ও তাঁর বোনেদের মধ্যে যে কতখানি

ভালবাসা ছিল, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত লিখেছেন, জওহরের মত দাদা পাওয়া তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। কৃষ্ণাও দাদার নাম করতে কী গর্বই না অনুভব করতেন। সত্যিই, এমন জগদ্বরেণ্য সহোদর লাভ করা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে?

শিশুদের জওহরলাল প্রাণ উজাড় ক'রে ভালবেসেছিলেন। তিনি হয়েছিলেন সারা ভারতের শিশুদের চাচাজী। তাই তাঁর শুভ জন্মদিনটি উৎসর্গ হয়েছে ভারতের শিশু-দিবসরূপে।

স্ত্রীর সঙ্গে জওহরলালের সুনিবিড় সম্পর্কের কথা ত আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। পরমাসুন্দরী, সুশিক্ষিতা ধনীর দুলালী কমলা। আদর্শ স্বামী পেয়ে তিনি দীনের বেশে, দেশের জন্য সমস্ত দুঃখ বরণ ক'রে হাসিমুখে তাঁর জীবন নিঃশেষ ক'রে গেলেন স্বদেশের ভাই-বোনেদের সেবায়। পুলিশের লাঠি, কারাগারের বীভৎসতা, শারীরিক অসুস্থতা, কিছুই এই বীর রমণীকে তাঁর কর্তব্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। তাঁর জীবনের এই অসামান্য ত্যাগের মূলে ছিলেন জওহরলাল নিজে। সত্যিকার ভালবাসা মানুষকে কতখানি ত্যাগ করতে শেখায়, এঁরাই ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। স্বামী যতোবার কারাগারে গেছেন, প্রতিবারই তিনি হাসিমুখে বিদায় দিয়েছেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে কমলা ভুগছেন—জওহরলাল রাজনৈতিক

কর্মের চাপে তাঁর প্রতি যথারীতি মনোযোগ দিতে পারছেন না। তবু এই মেয়েটি কোনোদিন কারো কাছে নালিশ জানান নি ; নীরবে স্বামীর আদর্শকে জীবনে বরণ ক'রে নিয়ে পরপারে চলে গিয়েছেন। কমলার বিচ্ছেদ জওহরের জীবনে চরম শোকের ব্যাপার। এমন সাথীকে হারিয়ে তাঁর অন্তর অনেকখানি শূন্য হয়ে গেল। তবু তিনি নিষ্কম্প চিত্তে বয়ে চললেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের পতাকা, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুকে উপেক্ষা ক'রে। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনীর উৎসর্গপত্রে লিখেছেন—To Kamala Who is no more. কমলার উদ্দেশে—যে কমলা আর নেই। কিন্তু ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে কমলা নেহেরুর নাম অক্ষয় হয়ে রইল। শুধু স্বামীর খ্যাতিতে তাঁর খ্যাতি নয়—পরশমণির স্পর্শে তাঁর জীবন সোনা হয়ে গিয়েছিল। কত না গৌরবের সঙ্গে জওহরলাল সেই কাহিনী তাঁর বইগুলিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

রুগ্‌ণা স্ত্রীর মৃত্যুশয্যায় বসে জওহরলাল তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছেন, দোলের দিন সকলের সঙ্গে আনন্দ উৎসবে মেতেছেন, প্রিয়তমা কন্যার বিবাহ-বাসরে তাকে আশীর্বাদ করছেন, নাতি রাজীবকে কোলে নিয়ে ছবি-তোলাচ্ছেন—কতভাবেই কাছের মানুষ জওহর-লালকে আমরা দেখেছি। স্নেহপ্রবণ পিতা, কর্তব্যরত স্বামী, পরিবারের পরামর্শদাতা, শিশুদের বন্ধু—নানারূপে

তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হয়েছি। কত সজীব ছিল এই মন, কত স্বাভাবিক! রাজনীতিকের গুরুগাম্ভীর্য এক মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে তিনি সহজেই আনন্দের রসে ডুবে যেতে পারতেন।

একবার শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে ভারতীয় নেতাদের বৈঠক হচ্ছিল। সেই সভায় সুরসুন্দর দিলীপ রায় কয়েকখানি গান গেয়ে শ্রোতাদের আনন্দবর্ধন করলেন। গান গাইবার সময়েও কয়েকজন নেতা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জওহরলাল বিরক্ত হয়ে তাঁদের বল্‌লেন—আপনারা গান শুন্‌তে যদি না চান্‌ ত চুপ ক'রে থাকুন—অন্যদের শুন্‌তে দিন্‌। রাজনীতির কঠিনতম সমস্যার যিনি সমাধান করেন, তিনি কত সহজে সঙ্গীতের রসে ডুবে যেতে পারেন, তা দেখলে অবাক্‌ লাগে।

ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর Feathers & Stones বইয়ে আহ্‌মদনগর দুর্গে জওহরলালের দৈনন্দিন জীবনের ভারী সুন্দর একটি ছবি এঁকেছেন। তাতে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছে। সীতারামাইয়া লিখেছেন—

শক্তি এবং রুচির সর্বতোমুখিতায় জওহরলাল যে সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা সহজেই বলা চলে। অন্য কারো ঘুম ভেঙে ওঠার আগেই তিনি বাগানে আসেন, বীজ ফেলেন, মাটি খোঁড়েন, চারা পোঁতেন, জল ঢালেন, নিড়ানি দেন। প্রখর রৌদ্রে মাথায় কেবল হ্যাট আর প্রবল বর্ষায় গায়ে কেবল

বর্ষাতি নিয়েই তিনি এখানে, ওখানে, সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। তিনিই একমাত্র মানুষ, যাঁর স্বাস্থ্যের বিন্দুমাত্র অপ্রাচুর্য নেই। তিনিই সর্বপ্রথমে রোগীদের দেখা-শোনা করেন, তাদের পথ্যের নির্দেশ দেন, ব্যবস্থা করেন, লঘুগুরু নানা আলাপ-আলোচনায় তাদের সময় কাটান, সাহায্য করেন, আনন্দ দেন। ছোটা হাজরি, লাঞ্চ, চা বা ডিনারের ঘণ্টা বাজার আগেই তিনি হেঁসেলে আসেন, তৈরী করেন চা আর কফি, টোস্ট শুকনো হবে কি মাখন দেওয়া হবে করেন তার তদারক, সাজান টেবিল, লক্ষ্য করেন বন্ধু-বান্ধবদের কি চাই, না চাই। প্রচুর ভ্রমণ এবং প্রচুরতর পঠনের ফলে মানুষ ও বস্তু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারটি এমন পূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তা থেকে তিনি যথাসম্ভব সুন্দরভাবে গল্প-কাহিনী রচনা করেন, বলেন—হোক না তা কোনো ভিয়েনীজ ডাক্তার কিংবা ইউ. পি-র ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে। স্পেন থেকে চীন, তুষার-শিখর আলবিয়ন থেকে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সিংহল, লেডী এস্টর থেকে মাদাম চিয়াং-কাই-শেক, ক্লিভেন্ডেন গোষ্ঠী থেকে কমিউনিস্ট কৃষ্টি, প্রস্তর যুগ থেকে ইস্পাত ও প্লাটিনামের যুগ, হ্যারো আর কেম্ব্রিজ হস্টেল থেকে স্বরাজ ভবন ও কমলা হাসপাতাল—অভিজ্ঞতার তাঁর কী অতল গভীরতা, দৃষ্টির কী প্রসারতা। যদিও রাজনীতি সম্পর্কে তিনি কদাচিৎ আলাপ করেন।

পৃথিবীর আর কোন রাজনৈতিক নেতার জীবনে এতখানি বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, দুঃসাহসিক কাজ—সব কিছুই তাঁর কাছে অত্যন্ত

প্রিয়। পরিপূর্ণ মানব বলতে আমরা যা বুঝি—পণ্ডিত জওহরলাল তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যা কিছু অশোভন, যা কিছু অন্যায়, তা কখনই বরদাস্ত করতে পারেন নি জওহরলাল। সহজেই চটে উঠতেন, আবার পরমূহূর্তে মধুর হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠত। জনসভায় লোকেরা বিকট চীৎকার ক'রে যখন গণ্ডগোলের সৃষ্টি করত, তখন পণ্ডিতজী তাদের এমন ধমক দিতেন যে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করত। একবার বিহারের ছাত্রেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রর্দশন করেছিল। তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে তাদের সেই অশান্ত সভায় স্থিরভাবে সদুপদেশ দিলেন। পরে ছাত্রদের লজ্জিত হ'তে দেখে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, ওসবে আমি কিছু মনে করি না—আমাকে অত সহজে দমাতে পারবে না।

এতখানি ধীশক্তি-সম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় নেতা হয়েও পণ্ডিতজীর চপলতা লক্ষ্য করবার বিষয়। বক্তৃতা দিতে দিতে উত্তেজিত হয়ে হয়ত হঠাৎ টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জনতা দেখতে চাইছে—তিনি মোটরের ছাদে উঠে বসলেন। এমন কি তরুণদের মত হাতের আস্তিন গুটিয়ে গুণ্ডাজাতীয় লোককে তেড়ে যেতেও তাঁর বাধল না। অন্যায়কে সহ্য করা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট যখন কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তার করা হ'ল—

তাঁদের বন্দীনিবাসে নিয়ে যাবার সময় ছেলের দল এক স্টেশন-প্লাটফর্মে "ভারতমাতার জয়!" প্রভৃতি ব'লে চীৎকার করছিল। পুলিশ যখন তাদের লাঠিচার্জ করল, পণ্ডিতজী রেগে আগুন হ'য়ে এই বলতে বলতে ছুটে গেলেন সেদিকে—To hell with the lathi charge. Dare you lathi charge the boys! তারপর পুলিশ অফিসারের বাধা পাওয়ায় রেল-কামরার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। পুলিশের এক বড়কর্তা তাঁকে চেপে জড়িয়ে ধরায় জওহরলাল প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর হাতের নাগালের মধ্যেই একজন কন্‌স্টেবল্ দাঁড়িয়ে ছিল। তার ঘাড়ে এসে পড়ল পণ্ডিতজীর প্রচণ্ড ঘুষি। শেষে কোনোমতে সবাই মিলে তাঁকে রেল-কামরায় ফিরিয়ে আনল।

আহমদ্‌নগর দুর্গে জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, আসফ আলি, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, বল্লভভাই, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রভৃতি একসঙ্গে বন্দী ছিলেন। তোমরা সবাই শুনে অবাক হবে, এঁদের সকলের জন্য রান্নার ভার ছিল জওহরলালের ওপর। পাঁউরুটি সেঁকা, ওম্‌লেট তৈরি করা, কুটনো কোটা, কুকার ধরানো, সব কিছুই তাঁকে করতে হ'ত। নতুন নতুন খাবার তৈরী ক'রে তিনি জাতীয় নেতাদের অবাক ক'রে দিতেন।

আবার ব্যাডমিণ্টন-কোর্টেও তাঁকে নিয়মিতভাবে দেখা

যেত। বরাবরই ব্যায়াম-অভ্যাস ও খেলাধূলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের কতগুলি অমূল্য বছর জেলের ভেতর কেটেছে। একদিনের জন্যও তিনি ব্যায়াম বাদ দেননি। শীর্ষাসন প্রভৃতি যৌগিক প্রক্রিয়াতেও তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তাই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েও তাঁর স্বাস্থ্য তরুণের মত মজবুত ছিল।

হাজার হাজার মাইল বিমানযোগে বা অন্যভাবে ভ্রমণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে নি। সংযত জীবনযাত্রার ফলে এমনই সুন্দর স্বাস্থ্যের তিনি অধিকারী হ'তে পেরেছিলেন।

জওহরলালের বাগান করবার ছিল ভয়ানক শখ। বন্দী-নিবাসের অনুর্বর ভূমিকেও পরম যত্নে ফুলের শোভায় তিনি সাজিয়ে তুলতেন। সবকিছুই তিনি নিজের হাতে করতেন। পিটুনিয়া, ড্রামণ্ড, কত রকম মরশুমি ফুলই না তিনি সেখানে ফুটিয়েছেন। জাতিকে গড়বার জন্য যাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে—সামান্য ফুলের চারার প্রতি তাঁর স্নেহ-যত্ন দেখলে অবাক হ'তে হয়। সামান্য কাজটিও তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতেন ব'লেই বিরাট বিরাট পরিকল্পনাও তাঁর হাতে সফল হ'তে পেরেছে। ব্রিজ্ খেলাতেও তিনি ছিলেন যেমন পটু, জগতের ইতিহাস রচনাতেও তিনি ছিলেন তেমনি সুদক্ষ। শুধু ইতিহাস রচনা করেন নি তিনি, তিনিই ছিলেন ইতিহাসের এক যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় নায়ক।



বিজয়ী জওহরলাল

কংগ্রেসের আদর্শ অহিংস সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা লাভ, শান্তির পথে দেশের সমৃদ্ধি সাধন। জওহরলাল সৈনিকের মতই সে আদর্শ জীবনে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের ওপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব ছিল অসামান্য। জওহরলাল দেশরক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও নিজের জীবনে অহিংসা-

মন্ত্রের সুদৃঢ় পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীন ভারতের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার পরেও তিনি শত্রুর অপরাধকেও ক্ষমার চক্ষেই দেখেছেন। ভালবেসে দুষ্টকে দমন করবার আশায় তিনি প্রাণও বিপন্ন করেছেন। গান্ধীজার সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও দু'জনারই নৈতিক আদর্শ ছিল মহান্। তাঁদের পরস্পারের সম্পর্কও ছিল বড় মধুর।

গান্ধীজী তাঁকে আদর ক'রে ডাকতেন "জওহর"—মণি-মুক্তার চেয়েও মূল্যবান্ তিনি। আর পণ্ডিতজী মহাত্মাকে বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি করতেন। সময়ে সময়ে মহাত্মার কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেও তিনি মনে জানতেন ও মুখে স্বীকার করতেন—গান্ধীজী ভারতের সর্বময় নেতা। জওহরলাল নাস্তিক ও বিজ্ঞানবাদী, আর গান্ধীজী প্রার্থনাশীল ভগবদ্‌ভক্ত। তবু দু'জনে একই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় ক'রে তুলেছেন। তাই জওহরলাল ছিলেন গান্ধীজী ও জনগণের মধ্যে সজীব সেতু।

গান্ধীজীর আদর্শে তিনি কতখানি বিশ্বাসী ছিলেন, তা তাঁর প্রথম পুলিশের লাঠি খাওয়ার ঘটনায় প্রমাণিত হয়। তিনি লিখেছেন, "প্রথম দুটি জোর আঘাতের পর আত্ম-রক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে পা দুটি আপনা-আপনি ফুটপাতের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল

—আমি কি এতই কাপুরুষ? পা থেমে গেল, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।" তাঁর অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল—সমস্ত শরীরে রইল তীব্র বেদনা। শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছেন জওহরলাল; অশ্বারোহী সৈন্যের দল তাঁদের আক্রমণ করল। কঠিন আঘাত পেয়েও তাঁরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমনি ক'রে আঘাত সহ্য করবার শক্তি সঞ্চয় করেছেন জওহরলাল। আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু অটল হয়ে তা নির্ভীকভাবে গ্রহণ করা অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচায়ক।

শ্রমিক এবং কৃষকদের বন্ধু ছিলেন জওহরলাল। পুঁথি-পড়া সাম্যবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতবাদ দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজী ১৯২৯ সালে প্রথম যেবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন, সেই বছরেই তিনি নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়নেরও সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতের কৃষাণ ও মজদুর সংস্থাগুলি স্বাধীনতা-সংগ্রামের শরিক হয়েছিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামকে দিয়েছিল এক প্রচণ্ড শক্তি।

২৬শে জানুয়ারি—প্রজাতন্ত্র দিবস। কিন্তু ভারত যখন স্বাধীন হয় নি, ভারতে যখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ছিল স্বপ্নের অতীত, তখন ঐ দিনটি ছিল স্বাধীনতা-দিবস।

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে ভারতের সর্বত্র প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানো হয়েছিল। তাই ২৬শে জানুয়ারি হয়েছিল স্বাধীনতা-দিবস। ঐদিনটি পালনের জন্য কতো নরনারী যে একদিন কতো নির্যাতন হেলায় উপেক্ষা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। পরাধীন ভারতে প্রতি ২৬শে জানুয়ারি তারিখে সারা দেশে স্বাধীনতা দিবস পালনের পরিকল্পনা স্বয়ং জওহরলালের। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যখন তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—তখন থেকেই এই স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। পরে আমরা যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা পেলাম, তখন থেকে ১৫ই আগস্ট হ'লো স্বাধীনতা-দিবস। আর সেই অমর ২৬শে জানুয়ারি? সেই শুভ দিনেই ১৯৫০ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হ'লো প্রজাতন্ত্র। তাই এখন ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র-দিবস রূপেই পালিত হয়।

জওহরলালের ধর্ম ছিল দেশের বন্ধন-মুক্তি। তিনি হিন্দুর ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর ঈশ্বর দেশমাতৃকা, প্রাণ দিয়ে দেশসেবাই তাঁর পূজা-অর্চনা। মৌলানা আজাদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই তর্ক বাধত। মৌলানা ছিলেন প্রগাঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাসী। জওহরলাল "ঈশ্বর" কথাটি ব্যবহার করতে চাইতেন না। তবু দু'জনার

মনের মিল ছিল যথেষ্ট। মুখে ধর্ম ধর্ম না করলেও পণ্ডিতজীর সারা জীবন অখণ্ড ধর্ম-জীবন ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যে পরাধীন, যে নিপীড়িত—তার কাছে বন্ধন-মুক্তিই যে সবচেয়ে বড় ধর্ম!

বহুবার বহুদিন ধরে কারাজীবন যাপন করা সত্ত্বেও জওহরলালের অন্তরের সরসতা কিছুমাত্র কমে নি, বন্দী-নিবাসের একঘেয়ে জীবনে তিনি পশুপাখীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে বৈচিত্র্য খুঁজে বের করতেন। দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছেন কাঠবিড়ালী আর টিকটিকিকে—পাখীদের যাওয়া-আসা। তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞাকে মনে মনে দৃঢ়তর ক'রে তুলেছেন। তাঁর দরদী মন রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়িয়েও অনেক সময় অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে। বিরাট এবং ক্ষুদ্রের অপরূপ সামঞ্জস্য ঘটেছে তাঁর জীবনে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ ছাপিয়ে কখনও শোষিতের আর্তনাদ তাঁর বুকে শেলসম বেজেছে—আবার কখনও হাস্য-পরিহাসে তিনি বন্ধুমহলে আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দিয়েছেন।

জওহরলালের মত স্বাধীনচেতা লোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন। তখনও ভারত স্বাধীনতা পায় নি। ইউরোপে দোর্দণ্ডপ্রতাপ হিটলার-মুসোলিনীর যুগ। হিটলার ও মুসোলিনী ছিলেন গণতন্ত্রের বিরোধী। তাঁরা ছিলেন ফাসিবাদী। আর নেহেরু ছিলেন গণতন্ত্রে গভীর বিশ্বাসী।

সেই সবেমাত্র কমলা মারা গেছেন ইউরোপে। তাঁর শেষকৃত্য সমাপন ক'রে দেশে ফিরছেন জওহরলাল শূন্য রিক্ত হৃদয় নিয়ে। ইতালির রাজধানী রোম হয়েই ফিরতে হবে। জওহরলাল রোমে পৌঁছলে প্রবল প্রতাপশালী মুসোলিনী স্বয়ং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন, বললেন, অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই তাঁর, শুধু জওহরলালের পত্নীবিয়োগে তাঁকে একটু শোকজ্ঞাপন করতে চান।

কিন্তু নেহেরুর কাছে বারবার দূত পাঠানো সত্ত্বেও তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। জওহরলাল দৃঢ়পণ করেছিলেন, যে বর্বর লোকটা নিরীহ হাবসিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতে পারে, যে গণতন্ত্রের ঘোর শত্রু, তার সঙ্গে কখনই দেখা করবেন না তিনি। ইতালির রাজধানীতে ব'সে কেউ ইতালির সর্বময় কর্তা সিনর মুসোলিনীকে যে এইভাবে অপমান করতে পারে, তা কল্পনাতীত। মুসোলিনীর জীবনে এমন অপমান আর বোধ হয় ঘটে নি!

বিদেশে যিনি এইরকম মনের দৃঢ়তা ও সাহস দেখাতে পারতেন, স্বদেশেও তিনি সকল বাধানিষেধকে হেলায় উপেক্ষা করবেন, তাতে আশ্চর্য কি?—হোক্ না সে স্বদেশ পরাধীন! কোন শহরে ম্যাজিস্ট্রেট জওহরলালকে প্রবেশ করতে বাধা দিলে তিনি সেই আদেশ সদর্পে অগ্রাহ্য করতেন। প্রায়ই বলতেন, I kick at such orders.

এলাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট একবার তাঁকে হুকুম দেন, তিনি কোন সভায় যোগ দিতে, বক্তৃতা করতে বা খবরের কাগজে বিবৃতি দিতে পারবেন না। জওহরলাল তৎক্ষণাৎ তাঁকে লিখে পাঠালেন, তিনি কি করবেন বা না করবেন, সে সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শ নেবার দরকার তাঁর হয় না। এই তেজোদৃপ্ত স্বভাবের ফলে তাঁকে বহুবার পুলিশের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। সবই তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। কারণ, তিনি বলতেন, দেশের স্বাধীনতার জন্যে সবার আগে চাই ব্যক্তির স্বাধীনতা।

কিন্তু জেলের ভেতর বসে যখন তিনি শুনেছিলেন, পুলিশের লাঠির আঘাতে তাঁর বৃদ্ধা জননী জ্ঞান হারিয়ে রক্তাক্ত দেহে পথের ওপর পড়ে গেছেন—তখন মর্মপীড়িত পুত্রের আত্মা বিদ্রোহ ক'রে উঠেছিল। প্রাণস্পর্শী ভাষায় আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন—"ঘটনার কয়েকদিন পরে জেলের ভেতর যখন খবর পেলাম—আমার বৃদ্ধা মা পুলিশের প্রহারে জ্ঞানশূন্যা অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে ছিলেন, তখন ভাবলাম, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে জানি না অহিংস নীতি আমাকে কতদূর আটকে রাখতে পারত! হয়ত দীর্ঘ বারো বছরের বহুপ্রয়াস-লব্ধ শিক্ষা এক মুহূর্তেই ভুলে যেতাম!"

একমাস পরে মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় জওহরলালের মা স্বরূপরাণী এলেন কারাগারে ছেলের সঙ্গে

দেখা করতে! মায়ের সেই গর্বোন্নত শিরের দিকে তাকিয়ে হয়ত জওহরলালের অন্তরের জ্বালা প্রশমিত হয়েছিল।

দীর্ঘ, বৈচিত্র্যহীন, কঠোর কারাবাসের মধ্যেও তাঁর কবি-মন কেমন ক'রে পাথেয় সঞ্চয় করত, তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর লেখায়। আলিপুর জেলের দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন— "আমার ভাগ্যে যে পরিবেশটুকু জুটেছিল, তার মধ্যে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না। গাছ কোথায় জন্মাবে? ছোট্ট আঙিনাটুকু আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা—কঠিন পাথরের মত নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ, একমাত্র প্রাণের চিহ্ন— পাঁচিলের ওপর দিয়ে দু'একটি গাছের মাথা চোখে পড়ত। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন সেই গাছগুলির পাতাও শুকিয়ে ঝরে গিয়েছিল। সারাদিন চেয়ে থাকতাম সেদিকে········হঠাৎ একদিন দেখি তাদের রিক্ততা ঘুচে গেছে—দু'একটি ক'রে সবুজ পাতা দেখা দিচ্চে; মনে হ'ত এ এক অপূর্ব সুন্দর রূপান্তর।

একটি গাছের ওপর চিলের বাসা ছিল।···দূর থেকে দেখতাম, পক্ষি-মাতা খাবার জোগাড় ক'রে এনে ছানাদের খাওয়াচ্ছে—একটু একটু ক'রে তাদের ডানা মেলে উড়তে শেখাচ্ছে········এদের জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে আমার মন ভরে উঠত।" যখন এই কারাজীবন খুব একঘেয়ে লাগত, তখন তিনি নানা কাজের মধ্যে নিজেকে

ডুবিয়ে দিতেন। এইভাবে মন আবার সজীব হয়ে উঠত।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলি। একবার এক অপরাধীকে বহু বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাকে রাখা হ'ল এক অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে। সে বুঝল এই নরকে কিছুদিন থাকলেই তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। সে খুঁজে পেতে পকেট থেকে চারটি পিন্ বার করল। তারপর সেগুলিকে সে সেই অন্ধকার ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে দিল। চারটি পিন্ খুঁজে বের করতে তার বহুদিন লেগে গেল। আবার সেগুলি সে মাটিতে ছড়িয়ে ফেল্ল। আরো কিছুদিন কাটল তার অনুসন্ধানে। অপরাধীর মেয়াদ ফুরোবার পর সকলে সবিস্ময়ে দেখল, তার মস্তিষ্ক ত ঠিক আছেই, উপরন্তু তার স্বাস্থ্যহানিও ঘটেনি।

আমাদের জওহরলালের দীর্ঘ কারাবাসের বেশির ভাগই কেটেছে পুস্তক-রচনায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ইতিহাসে তাঁর সে দান অমূল্য। যেসব মনীষী আর ত্যাগীর জেলে বসে লেখা চিঠি ও বই অমর হয়ে আছে—পণ্ডিত জওহরলাল তাঁদের অন্যতম।

শুধু আমাদের দেশের দুরবস্থাই যে তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করত তা নয়, পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করলে সেখানেই তাঁর মন ছুটে যেত। যখন ফাসিবাদী জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের

অসহায় নরনারীর ওপর বোমাবর্ষণ করেছে, তখন তিনি নিজে সেখানে মৃত্যুভয় তুচ্ছ ক'রে ছুটে গেছেন। সেখানে দুঃস্থদের আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়েছেন––অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। সেখানে দেশ-বিদেশের যেসব মানুষ ফাসিবাদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যে লড়াই করেছিল, তাদের জন্য প্যারিসে ও লণ্ডনে তিনি বহু সভা-সমিতি করেছেন। হাজার হাজার চীনা-শিশু ও নর-নারীদের যখন জাপানীরা হত্যা করেছিল, জওহরলাল তখন ছুটে গিয়েছিলেন চুংকিং-এ, পরাধীন ভারতের সঙ্গে উৎপীড়িত চীনের আন্তরিক যোগ স্থাপনের জন্য। জগতের বঞ্চিতদের কল্যাণের জন্য তিনি জীবন পণ করেছিলেন ব'লেই বঞ্চিতরাও তাঁকে আপন জন জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। পৃথিবীতে যেখানেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করত, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতো, সেখানেই জওহরলাল তার সমর্থনে তাঁর দৃঢ় হস্ত প্রসারিত করতেন। তাই এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ইউরোপে, আমেরিকায়, ওসেয়ানিয়ায়, সর্বত্রই ছিল তার অদ্ভুত জনপ্রিয়তা। তা ছিল যে কোন রাষ্ট্র-নায়কের ঈর্ষার বস্তু।

তাই নেহেরু ছিলেন স্বাধীনতার প্রতীক, গণতন্ত্রের প্রতীক, সমাজতন্ত্রের প্রতীক, মানবতার প্রতীক। এমন মানুষ ক'জন জন্মেছে এই পৃথিবীতে ?



স্বাধীনতাযুদ্ধে জওহরলাল

সাত বছর বাদে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯১২ সালে ভারতে ফিরলেন নেহেরু। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন তিনি চরমপন্থী ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবে পড়েছিলেন। দেশে যখন ফিরলেন, তখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে দিল্লীতে, সন্ত্রাসবাদে কিছুটা

ভাটা পড়েছে, মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা হয়েছে চালু। তাই তখন ভারতীয় রাজনীতিতেও কিছুটা ভাটা পড়েছে বলা চলে। তিনি ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাঁকিপুর অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই অধিবেশন তাঁর ভালো লাগে নি। সাহেবী পোশাক-পরা কেতাদুরস্ত একদল ইংরেজী-শিক্ষিত অভিজাত-শ্রেণীর মজলিস ছাড়া আর কী-ই বা ছিল এ অধিবেশনে। এঁদের মধ্যে কোথায় সে দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্র ; কোথায় সর্বত্যাগের সে উদ্দীপনা ? ইংলণ্ডে থেকে ভারতীয় রাজনীতির কথা তিনি ভাবতেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, এই সংকল্পও তাঁর ছিল। কিন্তু এই কি সে পরিবেশ ? নেহেরুর মনটা দমে গেল।

পর বৎসর ১৯১৩ সালে গান্ধীজীর কথা নেহেরু প্রথম শুনলেন। শুনলেন, অহিংস সত্যাগ্রহের কথা ; শুনলেন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কয়েক হাজার মাত্র ভারতীয় অহিংস সত্যাগ্রহের হাতিয়ার নিয়ে কি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামই না করেছে! নেহেরু তাঁর তরুণ মনের অন্ধকার আকাশে যেন ক্ষণিকের বিদ্যুৎ-ছটা দেখতে পেলেন।

১৯১৪ সালে বাধলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন। ১৯১৬ সালে হ'লো লখ্‌নৌয়ে কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগের অধিবেশন। কংগ্রেসের অধিবেশনে

কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতারা আবার হাত মেলালেন। সেই সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিল মুসলিম লীগও। গান্ধীজীর সঙ্গেও প্রথম সাক্ষাৎ হ'লো নেহেরুর। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকাটা অনেকখানি নেহেরুর মনের মতো হয়ে উঠলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে জনবল ও ধনবল দিয়ে সাহায্য করেছিল। তার বিনিময়ে সে চাইলো স্বরাজ—পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, শাসনব্যবস্থায় পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণের অধিকার। বিজয়ী ইংলণ্ড ভারতের সে দাবী ঘৃণাভরে উপেক্ষা করলো। চাপিয়ে দিলো নির্যাতনমূলক আইন রাউলাট বিল্‌স্। এই বিল কার্যকরী হ'লে ভারত হয়ে উঠবে একটি বন্দীশিবির। প্রতিবাদের ঝড় উঠলো সারা দেশে। গান্ধীজী নিলেন নেতৃত্ব। দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হ'লো। ৬ই এপ্রিল তারিখে সারা দেশে সত্যাগ্রহ পালিত হ'লো। কোথাও কোথাও তার আগেই সত্যাগ্রহ ও ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। পুলিস সেখানে গুলী চালালো। স্বাধীনতাযোদ্ধাদের শোণিতে ভারতের মাটি রঞ্জিত হ'লো। পুলিসী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো সারা দেশে। কিন্তু সে প্রতিবাদকে উপেক্ষা ক'রেই উদ্ধত ইংরেজ সরকার পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটালো এক বীভৎস

হত্যাকাণ্ড। ইংরেজ বাহিনীর গুলিতে বৈশাখী মেলার জন্য সমবেত হাজার হাজার নরনারী ও শিশুর রক্তে জালিয়ানওয়ালাবাগের রুদ্ধ প্রান্তরে রক্তগঙ্গা বইলো। ভারতবাসী রক্তস্নান করলো বিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামে। ক্রুদ্ধ ভারতবাসী ইংরেজের এই নৃশংস ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'লো। জওহরলালও ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই সংগ্রামে। সাহেবী পোশাকে সজ্জিত মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত বিজ্ঞ জনের মজলিস নয়—এই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনই যে তিনি চেয়েছিলেন! গান্ধীজী বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রচনা করলেন তাঁর দেশব্যাপী অহিংস সত্যাগ্রহের কর্মসূচী। ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গান্ধীজীর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালো। ঐ সময় তুরস্কে ইংরেজরা মুসলমানদের ধর্মনেতা খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা আন্দোলন শুরু করেছিল। মুসলমানদের ঐ দাবীকেও গান্ধীজী ভারতীয় সংগ্রামের অঙ্গীভূত ক'রে নিলেন। শুরু হ'লো অহিংস সত্যাগ্রহ ও খিলাফত আন্দোলন। এই সংগ্রামে তরুণ জওহরলালও রইলেন অন্যতম সেনানীর ভূমিকায়।

এই সময়েই তিনি পেলেন ভারতীয়দের শক্তির এক প্রধান উৎসের সন্ধান। ১৯২০ সালের মে মাসে

এলাহাবাদের কাছে যমুনা নদীর তীরে কয়েকশত কৃষক এসে জমায়েত হয়েছিল। তারা জমিদারদের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে জওহরলালের সাহায্য চাইলো। নেহেরু তাদের সঙ্গে গেলেন তাদের গ্রামে। নেহেরুর গ্রামে পদার্পণ এই প্রথম। যে দেশের আশি ভাগ লোক গ্রামে থাকে আর কৃষিকার্য করে, তাদের না চিনে ভারতকে চেনা যাবে কেমন ক'রে? জওহরলাল আবিষ্কার করলেন এক নূতন ভারত। দেখলেন কৃষকদের শোচনীয় দারিদ্র্য ও দুঃসহ অবস্থা, দেখলেন তাদের সংগ্রামের শক্তি, তাদের ঐক্যবদ্ধতা। তিনি নিজে পরে লিখেছেন, ওদের ওই অবস্থা দেখে নিজের আরামের জীবন ও শহরের ক্ষুদ্র রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা এসে গেল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এরাই যে শক্তির প্রধান উৎস, তা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হ'লো না। তিনি কৃষকদের সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হ'তে আহ্বান জানালেন। তিনি তাদের মধ্যে প্রচার করলেন অহিংস সত্যাগ্রহের রণকৌশল। তিনি তাদের বোঝালেন, তারাই প্রকৃত ভারত, ভারতের প্রকৃত শক্তি, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ শরিক। কৃষকদের সান্নিধ্যে এসে নেহেরু নিজের মধ্যেও এক অভাবনীয় শক্তির সন্ধান পেলেন।

এর অল্পদিন বাদেই তিনি শ্রমিকদের শক্তি সম্পর্কেও

সচেতন হলেন। শ্রমিকরাও নেহেরুর মধ্যে তাদের একজন নেতাকে খুঁজে পেলো। নেহেরু কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে দেশের কৃষক-সংগঠন ও শ্রমিক-সংগঠন-গুলিকে যুক্ত করতে চাইলেন। এজন্য তাঁকে কম প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'তে হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই চেষ্টা সার্থক হ'লো। কংগ্রেস হয়ে উঠলো কৃষক, মজদুর, নির্বিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকল ভারতীয়ের মিলিত সংগ্রামের প্রতিষ্ঠান।

ইতিমধ্যে মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কারব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তাতে আরও কিছুসংখ্যক ভারতীয়কে শাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস নূতন আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বয়কট করলো। জওহরলাল কংগ্রেসের বাণী ও কর্মসূচী প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্তে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। ইংরেজ সরকারের নিপীড়ন উপেক্ষা ক'রে দলে দলে ছাত্ররা স্কুলকলেজ থেকে বেরিয়ে এলো, দলে দলে উকিল-মোক্তাররা ইংরেজের আদালত ত্যাগ করলেন, অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় ঘৃণাভরে ইংরেজের দেওয়া সম্মান ও খেতাব বর্জন করলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন চললো পূর্ণোদ্যমে। মাদকদ্রব্যের দোকানগুলিতে পিকেটিং চললো।

সারা দেশ এক অভূতপূর্ব উত্তেজনায় ও উদ্দীপনায় কাঁপতে লাগলো।

ইংরেজ সরকারও ভয় পেলো। এই দেশব্যাপী অহিংস আন্দোলন যে কোন মুহূর্তে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত হ'তে পারে, সে সম্পর্কে তাদের উদ্বেগের সীমা রইল না। তাদের আতঙ্ক কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তা একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়। ১৯২১ সালের মে মাস। মতিলালের কন্যা ও জওহরলালের ভগিনী বিজয়লক্ষ্মীর বিয়ে। এই বিয়ে উপলক্ষে ভারতের প্রথম সারির নেতারা সকলেই এলাহাবাদে আসছেন। ফলে একটা রাজনৈতিক বৈঠকও হওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে। বিয়ের তারিখ ছিল ১০ই মে। আর ১১ই মে ছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতি-দিবস। তাই ইংরেজ শাসকদের আতঙ্কগ্রস্ত মস্তিষ্কে এই ধারণা দেখা দিলো যে, বিবাহটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল উদ্দেশ্য এলাহাবাদে একটা ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো। এলাহাবাদের ইংরেজ মহলে গুজবটা ছড়িয়ে পড়লো। ইংরেজ সরকারও সব দিক্ থেকে বিদ্রোহ প্রতিরোধের জন্যে তৈরী হ'লো। যাই হ'ক, বিয়ের দিনে আশঙ্কিত অভ্যুত্থান যখন ঘটলো না, তখন ইংরেজ সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো এবং তাদের দমননীতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর ক'রে তুললো। অনেক কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার

হলেন। নেহেরুকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো হ'লেও আপাততঃ তেমন কিছু করা হ'লো না। ইতিমধ্যে সরকার ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত-সফরের ব্যবস্থা করলো। উদ্দেশ্য ভারতবাসীর মনে আবার রাজভক্তির জোয়ার বয়ানো। কংগ্রেস সে সাধে বাদ সাধলো। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সফর-সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান বর্জন করবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালো কংগ্রেস। নভেম্বর মাসে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ এসে পৌঁছলেন বোম্বাইয়ে। তিনদিনব্যাপী হাঙ্গামা ও গোলযোগ দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হ'লো। হাঙ্গামা নিবারণের জন্য পুলিসকে গুলী চালাতে হ'লো। গান্ধীজী হিংসার এই আকস্মিক আত্মপ্রকাশে বিচলিত হয়ে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অনশন করলেন। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লো। কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েলস্ যেখানেই গেলেন, সেখানেই জনহীন রাজপথগুলি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তাঁর আগমনে যেসব উৎসব-অনুষ্ঠান হ'লো, সেগুলির একটিতেও একজনও ভারতীয় যোগ দিল না। ১৯শে নভেম্বর তারিখে কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হ'লো। ডিসেম্বরের গোড়াতে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় নেতারা অনেকেই কারারুদ্ধ হলেন। মতিলাল ও জওহরলাল, পিতাপুত্রেও ঐ সময় গ্রেপ্তার হ'লেন। তাঁদের উভয়েরই ছ'মাসের কারাদণ্ড হ'লো। মতিলাল, জওহরলাল ও

অন্যান্য কংগ্রেসনেতারা প্রায় সকলেই তখন জেলে। গান্ধীজী ছিলেন বাইরে। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি দুর্ঘটনা ঘটলো। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের কাছে চৌরিচৌরায় উত্তেজিত জনতা থানা পুড়িয়ে দিলো এবং এই অগ্নিকাণ্ডে ২২ জন পুলিস প্রাণ হারালো। গান্ধীজী জনতার এই হিংসাত্মক আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, অহিংস সত্যাগ্রহ তিনি প্রত্যাহার করছেন, কারণ অহিংস সংগ্রামের জন্য দেশবাসী এখনও প্রস্তুত নয়। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে দেশবাসী স্তম্ভিত হ'লো। কংগ্রেসের নেতাদের অনেকেই বিক্ষুব্ধ হলেন। মতিলাল ও জওহরলাল উভয়েই গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাতে পারলেন না। এইভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অধ্যায় শেষ হ'লো। গান্ধীজীকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করলো। বিচারে তাঁর ছ'বছরের কারাদণ্ড হ'লো। ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার আবিষ্কার করলো, জওহরলালকে যে অপরাধে দণ্ডদান করা হয়েছিল, সে অপরাধ জওহরলাল করেন নি। সুতরাং তিনমাস বাদেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হ'লো। জওহরলাল মুক্তি পেলেন। বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। তিনি মোট সাতবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর জীবনের দশটি বছর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কেটেছিল।

জওহরলাল কারাগার থেকে বাইরে এসে সর্বাগ্রে

আবার কংগ্রেস-সংগঠনকে শক্তিশালী ক'রে তোলার কাজে মন দিলেন। তিনি গান্ধীজীর সিদ্ধান্তকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে না পারলেও উপযুক্ত সৈনিকের মতোই গান্ধীজীর নির্দেশ মেনে চললেন। ঐ সময়ে এলাহাবাদে কিছু কিছু বস্ত্রব্যবসায়ী বিদেশী কাপড় বিক্রি করছিল। জওহরলাল তার প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হলেন। ফলে ইংরেজ সরকার আবার তাঁকে জুলুম ও ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করলো। বিচারে জওহরলালের একুশ মাসের কারাদণ্ড হ'লো। ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ইংরেজ সরকার একবার মহানুভবতা দেখাবার চেষ্টা করলো এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। জওহরলালও মুক্তি পেলেন।

জওহরলাল কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেখলেন, রাজনৈতিক দিক্ থেকে ভারতে যেন একটা অবসাদ ও নৈরাশ্যবোধ এসেছে। কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। মুসলিম লীগ জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। জওহরলাল দ্বিধা-বিভক্ত কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হলেন। মতিলাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতারা 'স্বরাজ্য দল' গ'ড়ে তুললেন এবং আইনসভায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভারতে কেবল ইংরেজ-শাসনই ছিল না। ভারতে

ছিল প্রায় ছ'শ দেশীয় রাজ্য। এগুলি ইংরেজ-প্রভুত্ব মেনে চললেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ছিল স্বৈরাচারী। বৃটিশ ভারতের তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। দেশীয় রাজ্যগুলির শোচনীয় অবস্থার আস্বাদ জওহরলাল শীঘ্রই পেলেন। এই সময়ে পাঞ্জাবের একটি ছোট দেশীয় রাজ্যে—নাভায়—আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলন নিজের চোখে দেখবার জন্য জওহরলাল ও তাঁর বন্ধু কেশবদেও মালব্য নাভায় গিয়েছিলেন। তাঁরা নাভায় ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ওপর দেশীয় রাজ্যের সরকারের কাছ থেকে নাভায় প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এলো। জওহরলাল জানালেন, তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার আগেই নাভায় প্রবেশ করেছেন; তাছাড়া, তাঁরা আন্দোলনকারী নন, তাঁরা দর্শকমাত্র। কিন্তু এই কৈফিয়তে দেশীয় রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট হ'লো না। তাঁদের গ্রেপ্তার ক'রে হাজতে ঢোকানো হ'লো। কেবল হাজতে রাখা হ'লো না, সাধারণ অপরাধীর মতো তাঁর হাতে হাতকড়া লাগানো হ'লো আর সেই হাতকড়া এঁটে দেওয়া হ'লো তাঁর সহযাত্রীর হাতকড়ার সঙ্গে। এইভাবে রেলস্টেশন থেকে তাঁদের রাজ্যের রাজধানীতে হাঁটিয়ে আনা হ'লো। তাঁদের তিনদিন জেলের একটি ছোট কুঠরিতে আটক রাখা হ'লো। সেই কুঠরিটির একটি বীভৎস বর্ণনা নেহেরু তাঁর

আত্মজীবনীতে লিখে রেখে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের আদালতে হাজির করা হ'লো। দেখা গেলো আদালত তো নয়, বিচারের প্রহসন। তাঁদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। পক্ষকাল বিচারের প্রহসন চললো। শেষে তাঁদের দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। অবশ্য, জওহরলালের গ্রেপ্তারের সংবাদ বৃটিশ ভারতেও পোঁছেছিল। নাভার দেশীয় রাজ্য সরকার জওহরলালের নাম না জানলেও বৃটিশ ভারতে এই তরুণ নেতা যে কতোখানি জনপ্রিয়, দিল্লীর ইংরেজরা তা জানতো। তাই তারা নাভা রাজ্যের বৃটিশ রেসিডেণ্টকে জওহরলালকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য নির্দেশ দিলো। জওহরলাল ও তাঁর সহযাত্রীরা মুক্তি পেলেন। কিন্তু নাভা রাজ্যের অপরিচ্ছন্ন কারাগার থেকে জওহরলাল টাইফয়েডের জীবাণু সঙ্গে নিয়ে এলেন। ফলে কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হলেন। নাভা দেশীয় রাজ্যের এই অভিজ্ঞতা থেকে জওহরলাল বুঝেছিলেন, অসংখ্য ভারতবাসী দেশীয় রাজ্যগুলিতে কি শোচনীয় অবস্থায় না আছে। তাই তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিতে আন্দোলন যাতে বিস্তারলাভ করে, এবং কংগ্রেস যাতে ঐ সব আন্দোলনকে সমর্থন ও সাহায্য করে, সেজন্য তৎপর হয়েছিলেন। এ বিষয়েও কংগ্রেসের মধ্যে তাঁকে কম সংগ্রাম করতে হয় নি। অবশ্য, অনেক কিছুর মতোই

শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হয়েছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলির অধিবাসীরা যে ভারতবাসী, এদের রাজনৈতিক অধিকারলাভ ছাড়া ভারতবাসীরা যে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতে পারে না, তা জওহরলালই কংগ্রেসের নেতাদের বুঝিয়েছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। কিছুদিন আগে তিনি এলাহাবাদ পৌরসভার সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯২৬ সালের মার্চ মাসে জওহরলাল স্ত্রী ও কন্যাসহ ইউরোপ ভ্রমণে যান। চৌদ্দ বছর বাদে ফের তিনি ইউরোপে এলেন। এই চৌদ্দ বছরে তিনি নিজেও যেমন অনেক বদলে গিয়েছিলেন, তেমনি বদলে গিয়েছিল ইউরোপ। একটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে ইউরোপে, অনেক সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে—জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুরস্ক থেকে রাজতন্ত্র চিরবিদায় নিয়েছে, হাঙ্গেরি চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি অনেক নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্রথম বিশ্বসংস্থা লীগ অব নেশন্‌স্। বিশ্ব-রাজনীতি আমরণ জওহরলালকে আকর্ষণ করেছে, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তিনি সংগ্রাম করেছেন সত্য, তবে বিশ্ব-রাজনীতির প্রবাহ থেকে তিনি ভারতকে কখনও বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেন নি। পৃথিবীর

রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে ভারতের ভাগ্যও যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেকথা তিনি যেমনটি বিশ্বাস করতেন, তেমনটি কংগ্রেসের মধ্যে আর কেউ বিশ্বাস করতেন না। আর বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল ছিল ইউরোপ। তাই ইউরোপ-সফরকে তিনি অপরিহার্য রাজনৈতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ব'লে মনে করতেন। জওহরলালই সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির সংগ্রামী জনসাধারণের সঙ্গে এক সারিতে আনেন এবং সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে সংগ্রাম চলছে, তার শরিক ক'রে তোলেন। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ শহরে নির্যাতিত জাতিসমূহের সম্মেলন হয়, তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে জওহরলাল যোগ দেন। এই সম্মেলনে চীনের মাদাম সুন ইয়াৎ-সেন ও ভিয়েৎনামের হো চি মিনের মতো বিখ্যাত এশীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বহু কমিউনিস্ট নেতাও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নকে তখন পরাধীন দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটি প্রধান শত্রু ব'লে মনে করতো। জওহরলালও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ ছিল অহিংস—সোভিয়েট বিপ্লবের মতো রক্তাক্ত পথে তা আসবে একথা তিনি কখনো বিশ্বাস করতেন না।

জওহরলাল এই সম্মেলনে যে ভাষণ দেন, তা ভারতের এই তরুণ নেতার প্রতি বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্মেলনে জওহরলাল কেবল ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সমস্যাকেই তুলে ধরেন নি, তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুক্তি সংগ্রামের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হন এবং সেই সব সমস্যা থেকে অনেক কিছু শেখেন। পিতা মতিলালও কয়েক মাস বাদে ইউরোপ যান। তখন তাঁরা পিতাপুত্রে সপরিবারে যান সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরে। বৃটিশ পার্লামেন্টের কমিউনিস্ট সদস্য শাপুরজী সকলৎওয়ালা মস্কো স্টেশনে তাঁদের স্বাগত জানান। মতিলাল ও জওহরলালকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাদর অভ্যর্থনা করেন। অনেক বিষয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্মধারা পিতা ও পুত্রকে মুগ্ধ করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে জওহরলাল যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সেদিন ফিরেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আর তা-ই একদিন ভারত-সোভিয়েট সৌভ্রাত্রের সৌধ গড়ে তুলেছিল।

ছয়-সাত মাস থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে জওহরলাল ইউরোপে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রায় দু বছর ইউরোপে কেটে গেল। তিনি ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরলেন। তিনি দেশে ফিরলেন নূতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মশক্তি নিয়ে। অসহযোগ আন্দোলন

প্রত্যাহারের পর যে নৈরাশ্যবোধ ও অবসাদ তিনি বোধ করছিলেন, তা এখন পুরোপুরি কেটে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন শেষ হয়েছিল এবং জাতীয় দল রূপে ভারতীয় বহু নেতা সংসদীয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে কংগ্রেসের সেই সংগ্রামী শক্তি ও সংগঠন আর ছিল না। গান্ধীজী সারাদেশে চরকায় সূতো কাটা আর অস্পৃশ্যতাবর্জন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বৃটিশ সরকারও এই আবহাওয়াকে স্থায়ী করবার জন্যে মণ্ট-ফোর্ড সংস্কার অনুসারে যে ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তার কার্যকরিতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেছিল। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয়কে সদস্যরূপে না নেওয়ায় ভারতে এই কমিশন নিয়োগের ফল হ'লো বিপরীত। ভারতবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো। এই কমিশন যে হিন্দু-মুসলমান সকল ভারতীয়ের পক্ষেই অপমানজনক, তা ভারতবাসী মিলিতকণ্ঠে ঘোষণা করলো।

ইউরোপ থেকে জওহরলাল ফিরে এসে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই অধিবেশনে তিনি স্বাধীনতা, যুদ্ধের বিপদ্ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রস্তাব

আনলেন, যা ইতিপূর্বে আর কখনও আনা হয় নি। প্রস্তাবগুলি বিনা বাধায় গৃহীত হয়ে গেল। জওহরলাল নিজেও অবাক হলেন। পরে তিনি বুঝেছিলেন, কংগ্রেসে উপস্থিত সদস্যরা এইসব প্রস্তাবের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বোঝেননি। তাই সেগুলির ওপর গুরুত্বও দেননি, তাঁরা বিনা বাধায় সেগুলি গৃহীত হ'তে দিয়েছিলেন। অবশ্য, গান্ধীজী এইসব প্রস্তাবে খুব খুশী হন নি। তিনি ১৯২৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে জওহরলালকে লিখেছিলেন, "তুমি অনেক আগে এগিয়ে চলেছ। তোমার বেশ কিছু সময় চিন্তা ক'রে এবং নিজেকে ধাতস্থ ক'রে এ বিষয়ে এগোনো উচিত।" গান্ধীজীর এই উপদেশ যে কতোখানি সত্যি, জওহরলাল তা শীঘ্রই বুঝেছিলেন। ঐ সময় জওহরলাল কংগ্রেসের সাইমন কমিশন বর্জনের প্রস্তাবটিও গ্রহণ করেন। তিনি শীঘ্রই শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কেও সচেতন ও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও করছে, সে বিষয়ে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহ ও কৌতূহল শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নূতন প্রেরণা যোগালো। তাঁর অজ্ঞাতেই ১৯২৮ সালে তিনি নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। অবশ্য, এতোখানি বাড়াবাড়ির জন্য তিনি

প্রস্তুত ছিলেন না। গ্রামাঞ্চলেও কৃষকরা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। উত্তর প্রদেশে ও গুজরাটে কৃষক আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গুজরাটের বরদৌলিতে কৃষকরা রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সরকারকে রাজস্ব হ্রাস করতে বাধ্য করেছিল। জওহরলাল এই ঘটনাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন, "বরদৌলি ভারতীয় কৃষাণদের আশা, শক্তি ও বিজয়ের নিশানা হয়ে উঠেছে।"

সাইমন কমিশন এলো ভারতে। সারা ভারতে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বইলো। 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনিতে ভারতের আকাশ-বাতাস পূর্ণ হ'লো। সাইমন কমিশনের সদস্যরা ভারতের যেখানেই গেলো, ঐ একই ধ্বনি তাদের অভ্যর্থনা জানালো। তারা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলো। এমন কি রাত্রিতে শৃগালের ডাকের মধ্যেও তারা ঐ ধ্বনির স্বরই শুনলো। সাইমন কমিশন বর্জনের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করবার জন্য জওহরলাল সারা দেশে ঘুরে বেড়ালেন, অসংখ্য সমাবেশে ভাষণ দিলেন। ইংরেজ সরকারও এইসব সভা সমিতি ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করলো। বহু জায়গায় পুলিশ লাঠি চালালো, গুলি চালালো। পাঞ্জাবের সর্বভারতীয় নেতা লালা লজপৎ রায়কে একজন ইংরেজ পুলিস অফিসার এমনভাবে

প্রহার করলো যে, তার ফলেই কয়েকদিন বাদে তাঁর মৃত্যু ঘটলো। দেশে বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ বইলো। লখ্‌নৌ-এ জওহরলালও পুলিসের হাতে গুরুতরভাবে মার খেলেন। বহু লোক পুলিসের লাঠিতে ও গুলিতে আহত হলো। যে পুলিস অফিসার লালা লজপৎ রায়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদীরা তাকে হত্যা করলেন, দিল্লীর আইনসভা ভবনে বোমা ফাটালেন। বাংলাদেশেও সন্ত্রাসবাদীরা আবার জেগে উঠলেন। সরকারের দমননীতি কঠোর থেকে কঠোরতর হ'লো। পুলিসের লাঠিচার্জ ও গুলি চালানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। জেলগুলি ভরে গেলো। বাংলাদেশে পাটকলগুলিতে ধর্মঘট হ'লো। কলকাতায় ঝাড়ুদাররা হরতাল করলো। বোম্বাইয়ে লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করলো। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে দেশের বহু বিখ্যাত শ্রমিক নেতাকে সরকার গ্রেপ্তার করলো এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের মামলা আনলো। জওহরলাল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন—চাঁদা সংগ্রহ ক'রে তহবিল গড়ে তুললেন, বহু শ্রেষ্ঠ আইনজীবীকে অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনে নিয়োগ করলেন।

ভারতে রাজনৈতিক ঝড় যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, তখন দেশের সর্বদলীয় নেতারা মতিলালের

সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। এই কমিটির কাজ হবে, ভারতের জন্য সংবিধান রচনা। এই কমিটি কিন্তু স্বাধীনতার পরিবর্তে ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই তাঁদের দাবীরূপে স্থান দিলেন। জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে এর বিরোধিতা করলেও মতিলাল ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। তাছাড়া, এই কমিটিতে জমিদারদের অধিকার রক্ষার জন্য সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় জওহরলাল তারও তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি কমিটি থেকে পদত্যাগও করতে চাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে পদত্যাগ থেকে বিরত রইলেন। কিন্তু পিতা ও পুত্রের মধ্যে মতপার্থক্য একটি চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছল। গান্ধীজী এইসব আলোচনা থেকে দূরেই রইলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অহিংসা, অস্পৃশ্যতাবর্জন, মাদকদ্রব্য ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি বিষয়ে সারাদেশে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন। জওহরলালও দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে কৃষক ও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হ'তে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্যাগ করতে, সন্ত্রাসবাদের পথ বর্জন করতে, স্বাধীনতার দাবী তুলতে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'লো। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি হলেন মতিলাল। সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাব যাতে কংগ্রেস

গ্রহণ করে, সেজন্যে মতিলাল প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত একটা আপোস হ'লো। সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি ভারতের জন্য যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দাবী করেছেন, ইংরেজ সরকার যদি তা এক বৎসরের মধ্যে মেনে নেয়, তবে ভারত ডোমিনিয়ন স্টেটাস নেবে। নইলে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করবে।

পর বৎসর, ১৯২৯ সালে, জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হলেন। জওহরলাল ডোমিনিয়ন স্টেটাসের উপযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। পূর্ণ স্বাধীনতাই দাবী করলেন তিনি। তাই তাঁর সভাপতি মনোনয়নে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের মধ্যে একটু গুঞ্জন উঠলো। গান্ধীজী বললেন, "নিঃসন্দেহে জওহর চরমপন্থী, সাময়িক পরিপার্শ্বের তুলনায় তার চিন্তা অনেক অগ্রগামী। কিন্তু তার মধ্যে যে বিনয় ও বাস্তবতাবোধ আছে, তাতে কোনও বিষয়কে সে চূড়ান্ত অবস্থায় আনবে না। হীরকের মতো সে বিশুদ্ধ। তার সততা সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে।··· তার হাতে জাতি নিরাপদ।"

এদিকে ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলো যে, ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতির লক্ষ্য হ'ল ডোমিনিয়ন স্টেটাস। তৎকালীন বড়লাট লর্ড আরুইন ভারতীয় নেতাদের লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণও জানালেন।

কিন্তু ওই ডোমিনিয়ন স্টেটাস ভারত কবে পাবে, সে সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না। অথচ কংগ্রেসের দাবী ছিল এক বৎসরের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পেলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে। এক বৎসর প্রায় উত্তীর্ণ হ'লো। তাই কংগ্রেস যে এখন নিজের প্রতিশ্রুতিমতো পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে, তার আভাস পাওয়া গেল পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক ও প্রচারক জওহরলালকে কংগ্রেসের সভাপতিপদে মনোনয়নে। তবু কংগ্রেস কিছুটা আপোসের মনোভাব নিয়ে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করলো। তাতে বলা হ'লো, লণ্ডনে যে গোল টেবিল বৈঠক হবে, তা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই হবে, তাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকবে, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে, এবং ভারত যেন ইতিপূর্বেই ডোমিনিয়ন স্টেটাস পেয়েছে, এই মনোভাব নিয়েই ভারতের শাসনকার্য পরিচালিত হবে। কিন্তু কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে জওহরলাল খুশী হলেন না। পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছুতেই তিনি সুখী হ'তে পারলেন না। তিনি পদত্যাগের কথা ভাবলেন। তবে কংগ্রেসে দলাদলির সৃষ্টি হবে ভেবে তিনি তা থেকে বিরত হলেন। তাই তিনি এই প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত সই করলেন। কিন্তু সই করবার পর ভাবলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীই যখন

পরিত্যক্ত হয়েছে, তখন কংগ্রেস সভাপতির পদ নিয়ে লাভ কি? তিনি কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতি হবেন না বলেই স্থির করলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর একটি পত্র তাঁকে তাঁর এই সংকল্প থেকে বিরত করলো। কিন্তু কংগ্রেসের এই প্রস্তাবও বৃটিশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হ'ল না। ২৯শে ডিসেম্বর মতিলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, মিঃ জিন্না, তেজবাহাদুর সাপ্রু সহ গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করলেন। বড়লাট জানালেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের আলোচনার কোনও কথা নেই, তবে রাজবন্দীদের তিনি মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন।

বৃটিশ সরকারের গোল টেবিলের প্রস্তাব যে নিছক ধাপ্পা, তা বুঝতে ভারতবাসীদের দেরি হ'লো না। সকলের দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ হ'লো কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের দিকে—যে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন জওহরলাল নিজে। পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এই অধিবেশন একটা যুগকে চিহ্নিত করেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক এই অধিবেশনে যোগ দিলেন। শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আসীন নবনির্বাচিত সভাপতি জওহরলালকে নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা অসংখ্য মানুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে রাজপথগুলি অতিক্রম করেছিল। মাতা স্বরূপরানী এই

শোভাযাত্রা দেখবার জন্যে পথিপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের উপর পুষ্পবৃষ্টিও করলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতকে সুস্পষ্ট-ভাবে ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। তিনি জানালেন, তিনি প্রজাতন্ত্রী, তিনি সমাজতন্ত্রী, তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি ঘোষণা করলেন, ভারতের বহুবিধ সমস্যা আছে—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা, দেশীয় রাজ্যের সমস্যা, কৃষকদের সমস্যা, শ্রমিক-দের সমস্যা। কিন্তু ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা পেলেই সে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তিনি স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে কঠোর সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হ'তে আহ্বান জানালেন। লাহোরের এই অধিবেশনেই কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করলো। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মধ্যরাত্রিতে স্বাধীনতার এই দাবী চূড়ান্তরূপে ঘোষিত হ'লো এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রতীকরূপে উড্ডীন হ'লো ত্রিবর্ণ পতাকা।

মতিলাল, যিনি এতোদিন ছিলেন নরমপন্থী, যিনি ছিলেন ডোমিনিয়ন স্টেটাসে বিশ্বাসী, তিনিও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে পুত্রের সঙ্গে একমত হলেন। তিনি কংগ্রেস সদস্যদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলি ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসবার জন্যে আহ্বান জানালেন।

কংগ্রেস কমিটিকে একটি আইন অমান্য এবং প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন স্থানে ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী রচনা করতে বলা হ'লো। স্থির হ'লো, ভারত যতোদিন স্বাধীনতা লাভ না করবে, ততোদিন প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারি দিনটি স্বাধীনতা দিবসরূপে সারা দেশে উদযাপিত হবে।

সংগ্রামের জন্য দেশ দ্রুত প্রস্তুত হ'লো। আবার গান্ধীজীই হলেন সংগ্রামের সেনাপতি। গান্ধীজী লবণ আইন অমান্য দিয়েই সংগ্রামের সূত্রপাত করবেন, স্থির করলেন। এমন একটা সামান্য ব্যাপার দিয়ে যে দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হ'তে পারে, তা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হ'লো। অনেকের কাছে হাস্যকরও মনে হ'লো। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে গান্ধীজী ডাণ্ডিতে লবণ আইন আনুষ্ঠানিকভাবে অমান্য করলেন। গান্ধীজী তাঁর আশ্রম থেকে ডাণ্ডি পর্যন্ত প্রায় ২০০ মাইল পথ পদব্রজেই হেঁটে গেলেন। এই পদযাত্রায় তিনি পথের ধারে সমবেত অসংখ্য মানুষকে অহিংস সংগ্রামের বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ করলেন। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো সংগ্রামের ঢেউ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। একটি স্ফুলিঙ্গ থেকেই যে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে—তা গান্ধীজী দেখালেন। এ তো সামান্য আইন অমান্য নয়, এ যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে

দেশব্যাপী জেহাদ ! মতিলাল, যিনি গান্ধীজীর এই সংগ্রামের কর্মসূচীতে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন না, তিনিও বিচলিত হলেন। তিনিও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর এলাহাবাদের বাসভবনটি তিনি কংগ্রেসকে দান করলেন এবং নিজেরা একটি নূতন বাড়িতে উঠে গেলেন। এই বাসভবনটি আনন্দভবন নামে পরিচিত ছিল। এখন এর নাম হ'লো স্বরাজ-ভবন।

সরকারও প্রথমে এটাকে একটা হাস্যকর ব্যাপার মনে করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝলো এর তাৎপর্য কি। শুরু হ'লো কঠোর দমননীতি। দমননীতি কঠোর থেকে কঠোরতর হ'তে লাগলো যতোই এই আইন অমান্য আন্দোলন শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে, ভারতের দূরতম পল্লীতেও ছড়িয়ে পড়লো। ১৪ই এপ্রিল তারিখে জওহরলালকেও গ্রেপ্তার করা হ'লো। বিচারে তাঁর ছ মাসের কারাদণ্ড হ'লো। ৫ই মে তারিখে গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হলেন। জওহরলালের পত্নী কমলা ছিলেন অসুস্থা। তিনিও এই আন্দোলনে দৈহিক দুর্বলতাকে ছেড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ৫ই জুন তারিখে মতিলালকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। নৈনি জেলে পিতা-পুত্রের ঘটলো সাক্ষাৎ। অসংখ্য নরনারী হাসিমুখে কারাবরণ করলেন। কারাগারগুলি উপছে পড়লো। ইংরেজ সরকার প্রমাদ গণলো।

এখন ইংরেজ সরকার আপোসের মনোভাব দেখালো। এ বিষয়ে কংগ্রেসের বাইরে যেসব বিশিষ্ট নেতা ছিলেন, তাঁরা কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা আপোস ঘটাবার জন্যে উদ্যোগী হ'লেন। বড়লাট গান্ধীজী, মতিলাল ও জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন। তাঁদের পুণার কাছে কিরকিতে আনা হ'লো। সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে মতিলাল ও নেহেরু যাতে আগে আলোচনা করতে না পারেন, সেজন্য পৃথকভাবে তাঁদের রাখা হয়েছিল। কিন্তু মতিলাল গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবী মেনে নেওয়া হ'লো। এই সময় বল্লভভাই প্যাটেলও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনিও এসে পৌঁছলেন।

বড়লাটের সঙ্গে আলোচনায় কোনও ফল হ'লো না। এঁরা সকলেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করলেন। ইংরেজ সরকার তা মেনে নিতে রাজী হ'লো না। আবার তারা জেলে ফিরে এলেন। মতিলাল জেলে কিছুদিন বাদে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হ'লো। জওহরলালও তাঁর জেলের মেয়াদ শেষ ক'রে বাইরে এলেন। কিন্তু মাত্র আটদিন বাইরে থাকবার পর আবার তাঁকে জেলে ফিরতে হ'লো। এবার দু বছরের জন্য কারাদণ্ড হ'লো। তিনি জরিমানা দিতে

অস্বীকার করায় জেলের মেয়াদ বাড়লো আরও পাঁচ মাস।

এদিকে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসেছিল। কংগ্রেস এই বৈঠকে যাতে যোগ দেয়, সেজন্য ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতাদের মুক্তি দেওয়া হ'লো। জওহরলালও মুক্তি পেলেন। এই সময় মতিলাল আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জওহরলাল জেল থেকে বেরিয়েই বাবার কাছে এলেন। কয়েকদিন বাদেই ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মতিলালের মৃত্যু হ'লো।

ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি গান্ধীজী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন। এ ব্যাপারে জওহরলালের আন্তরিক সমর্থন ছিল না। কারণ, এ ধরনের বৈঠকে কোনও ফল হবে না, অধিকন্তু এতে আন্দোলনের তীব্রতা কমে যাবে, তিনি তা ভালো-ভাবেই জানতেন। হ'লোও তা-ই। গান্ধীজী শূন্যহাতে গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জওহরলালকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সরকার তার দমননীতিও আবার তীব্র ক'রে তুলেছিল। গান্ধীজী আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন, স্থির করলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁকে সে সুযোগ দিল না, ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে গ্রেপ্তার

করলো। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হ'লো। কংগ্রেস-নেতাদের প্রায় সবাইকে গ্রেপ্তার করা হ'লো। জওরহলালের দুই বোনও গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের প্রত্যেকের এক বছরের কারাদণ্ড হ'লো। জওহরলালের বৃদ্ধা মা-ও পুলিসের হাতে প্রহৃত হলেন। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় আশী হাজার লোক কারারুদ্ধ হ'লো।

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসের শেষে জওহরলালের মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাই সরকার জওহরলালকে মেয়াদের কয়েকদিন আগেই মুক্তি দিলেন। জওহরলাল জেল থেকে বেরিয়েই মার কাছে ছুটে এলেন। ছেলেকে কাছে পেয়ে মা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। জওহরলাল এবার পাঁচ মাস জেলের বাইরে ছিলেন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হ'লো। এবার তাঁকে এলাহাবাদ থেকে আনা হ'লো কলকাতায়। তিনি বন্দী রইলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। এবার তাঁর কারাদণ্ড হ'লো দু বছরের জন্যে। এখানে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হ'তে থাকায় মে মাসে তাঁকে দেরাদুন জেলে নিয়ে যাওয়া হ'লো। এই সময় তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি হয়েছিল।

ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল। গান্ধীজীও আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বিদেশ থেকে যেসব সংবাদ আসছিল, তাও জওহরলালের

উদ্‌বেগের কারণ হয়েছিল। জাপান নির্লজ্জভাবে চীনের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, জার্মানিতে নাৎসী দলনায়ক হিটলার ক্ষমতা অধিকার করেছিল, লীগ অব নেশন্‌স্ ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে ছিল। এই সমস্ত ব্যাপারই জওহরলালকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। কারান্তরালের ব্যাকুল উদ্‌বেগপূর্ণ দিনগুলি তিনি গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেছিলেন। এরই ফল তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ Glimpses of World History ও আত্মজীবনী। প্রথম গ্রন্থখানি তিনি তাঁর কিশোরী কন্যা ইন্দিরাকে লেখা পত্রগুচ্ছের আকারে লিখেছিলেন। এই বইখানি লেখা হয়েছিল ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে। ১৯৩৪ সালের জুন মাস থেকে তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী।

দিনে দিনে কমলার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটছিল, তাঁর দুর্বল দেহ আরও দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে জওহরলালকে এলাহাবাদ জেলে আনা হ'ল। তিনি তাঁর অসুস্থা স্ত্রী ও রুগ্‌ণা মাকে দেখবার জন্যে কয়েকদিনের জন্যে শর্তাধীনে মুক্তি পেলেন। দশদিন তিনি জেলের বাইরে ছিলেন। আবার তাঁকে কারাগারে ফিরে আসতে হ'লো। এবার তাঁকে নৈনি জেলে রাখা হ'লো, যাতে তিনি প্রয়োজন হ'লে অসুস্থা স্ত্রীকে দেখতে যেতে পারেন। কমলাকে ভাওলি স্বাস্থ্যাবাসে

স্থানান্তরিত করা হ'লে স্ত্রীর কাছাকাছি রাখবার উদ্দেশ্যে জওহরলালকে নৈনি জেল থেকে আলমোড়া জেলে আনা হয়। প্রায় তিন সপ্তাহ বাদে তাঁকে একবার ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হ'তো। ১৯৩৫ সালের মে মাসে কমলাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপ নিয়ে যাওয়া হ'লো। জওহরলালের কারাগারের দিনগুলি আরও দুঃসহ হয়ে উঠলো। অবশেষে মেয়াদ ফুরোবার চার মাস আগেই তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেয়েই জার্মানি রওনা হয়ে গেলেন। কমলা একটু সুস্থ বোধ করলে তিনি একবার ইংলণ্ডেও ঘুরে এলেন।

ইতিমধ্যে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত শাসন আইন পাস করেছিল। এই আইন ১৯৩৭ সাল থেকে চালু হওয়ার কথা ছিল। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে কমলাকে লোসানের কাছে একটি স্বাস্থ্যাবাসে আনা হ'লো। তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি না হ'লেও আর বিশেষ অবনতি ঘটে নি। এদিকে ভারতে জওহরলালকে ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করা হয়েছিল। এই অবস্থায় রুগ্‌ণা স্ত্রীকে ফেলে দেশে চ'লে আসতে জওহরলাল দ্বিধাবোধ করছিলেন। কিন্তু কমলা তাঁকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে বললেন। কারণ, তিনি জানতেন, সবার ঊর্ধ্বে দেশ। এই দেশের জন্যে তিনি নিজেও তো কম ত্যাগ স্বীকার করেন নি। তাই

জওহরলাল ১৯৩৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিমানে দেশে ফিরবেন স্থির হ'লো। কিন্তু হঠাৎ কমলা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কন্যা ইন্দিরা ঐ সময়ে ইউরোপেই পড়াশুনো করছিলেন। তিনিও মায়ের কাছে এসে ছিলেন। ঠিক ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখেই স্বামী ও কন্যার কোলে মাথা রেখে কমলা পরপারে চ'লে গেলেন। কমলার শেষকৃত্য সমাপন ক'রে নিতান্ত শূন্য হৃদয়ে জওহরলাল দেশে ফিরলেন।

দেশে ফিরে জওহরলাল দেখলেন, রাজনৈতিক আবহাওয়া আরও খারাপ। নেতাদের মধ্যে সংগ্রামের ইচ্ছা যেন উবে গেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বৃটিশ সরকার যা দিয়েছে, তাতেই যেন নেতারা আপাততঃ সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই শাসন ব্যবস্থা ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে চালু হবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে এবং প্রদেশ-গুলিতে গভর্নরের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হ'লেও নির্বাচিত সদস্যরা সেখানে মন্ত্রিসভা গঠন ক'রে প্রাদেশিক শাসনে অংশ নিতে পারবেন। ভোটারের সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ হ'লেও তা প্রায় তিন কোটির মতো ছিল। তাই দেশের দলগুলি প্রাদেশিক আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে শাসন ক্ষমতা লাভ করতে উৎসাহিত হয়ে

উঠল। কংগ্রেসও নির্বাচনে নামবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জওহরলাল এই নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন না, তবে আইনসভায় প্রবেশ বা মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর নিজের মত ছিল কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হয়ে আইন-সভাগুলি বর্জন করবে এবং এই নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে অচল ক'রে দেবে। তিনি বললেন, "এখন আমরা জন-সাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়েছি। কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ লক্ষের নিচে নেমে গেছে। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ ক'রে আমরা জনসাধারণের সঙ্গে আবার সংযোগ সাধন করবো এবং জনসাধারণকে কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলবো।" জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের আদর্শের কথা প্রচার করতে লাগলেন।

কিন্তু প্রাচীনপন্থী নেতারা জওহরলালের সঙ্গে একমত হ'তে পারলেন না। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে প্রাচীনপন্থীদেরই ছিল প্রাধান্য। তাঁরা জওহরলালের এই মতের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনী অভিযানে ও তাঁর নিজস্ব মতপ্রচারে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী আবার তাঁকে এ বিষয়ে বিরত করলেন। কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হ'লেও প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না, এমন আশা জওহরলাল

এখনো করতে লাগলেন। নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটে বিজয়ী হ'লো। দেখা গেল, প্রাদেশিক শাসনে গভর্নর হস্তক্ষেপ করবেন না, এরকম প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠনে ইচ্ছুক। জওহরলাল নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তকেই মেনে নিলেন। বড়লাট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, গভর্নর অযথা মন্ত্রি-সভার কাজে হাত দেবেন না। ফলে কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলো। সিন্ধু ও আসামেও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। সেখানেও তারা অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলো। কেবল পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হ'লো। অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই না পেয়ে মুসলিম লীগ হতাশ হ'লো। কংগ্রেসকে হিন্দু সংস্থা এবং মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক দল ব'লে দাবী করতে লাগলো। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদের উপর অবিচার অত্যাচার করছে, এমন ধুয়াও তুললো।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কাজে জওহরলাল সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজীকে একটি পত্রে তিনি জানালেন, "আমরা এতো পরিশ্রম ক'রে জনসাধারণের মনে যে ঠাঁই ক'রে নিয়েছিলাম,

তা আমরা হারাচ্ছি। আমরা সাধারণ রাজনীতিকের স্তরে নেমে পড়ছি।”

১৯৩৭ সালে জওহরলাল ব্রহ্ম ও মালয় সফর ক’রে ফিরে এলেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর মা মারা গেলেন। সংসারের সঙ্গে তাঁর শেষ বাঁধনটুকুও প্রায় ছিন্ন হয়ে এলো। এই সময়ে ইউরোপে রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্তন চলছিল। স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইতালি ও জার্মানির সাহায্যে প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ফাসিবাদী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিল। সেখানে চলছিল প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ। হিটলার-শাসিত জার্মানি চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। জওহরলাল আবার ইউরোপকে চাক্ষুষ দেখবার জন্য ইউরোপ যাত্রা করলেন। হিটলার তাঁকে জার্মানিতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ক’রে স্পেন ও চেকো-শ্লোভাকিয়া পরিদর্শনে গেলেন। তিনি ইংলণ্ড, জেনেভা প্রভৃতি ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন। তিনি ফেরবার পথে মিশরের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন।

১৯৩৮ সালে আবার তাঁকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করবার কথা উঠলে তিনি বেনামীতে একটি প্রবন্ধ লিখে বললেন, একজনের একাদিক্রমে বার বার প্রেসিডেণ্ট হওয়া উচিত নয়। এতে একনায়কতন্ত্র দেখা দিতে পারে।

এবার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ইউরোপ থেকে ফিরে জওহরলাল লুধিয়ানায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের সহযোগিতাও যে একান্ত দরকার, সে বিষয়ে জওহরলাল প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি স্বল্পকালের জন্যে সিংহল সফরেও যান।

১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। আবার একটি বিশ্ব যুদ্ধের দুন্দুভি রব আকাশে বাতাসে শোনা যেতে লাগলো। এই সংকট মুহূর্তে দেশ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা জওহরলালের ছিল না। তবু একবার চীন সফরে যাওয়ার জন্যে তিনি খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। এখানে জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। তাদের এ যুদ্ধ ছিল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ। তাই চীনাদের প্রতি জওহরলালের সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। আক্রমণকারী জাপানের প্রতি তাঁর ঘৃণাই ছিল স্বাভাবিক। তাই বিমানে ক'রে জওহরলাল চীন সফরে গেলেন। কিন্তু চীন দেশে দু সপ্তাহের বেশি কাটাতে পারলেন না। ইউরোপে জার্মানির সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বেধে গেল। আর সেই যুদ্ধে ইংরেজ সরকার

ভারতকে ভারতবাসীদের সম্মতি না নিয়েই জড়িত করলো।

এর অর্থ ছিল বৃটিশ সরকার আজও ভারতকে তার সম্পত্তি ব'লেই মনে করে। কংগ্রেস বারে বারে ফাসিবাদ ও নাৎসীবাদের তীব্র নিন্দা ক'রে এসেছে। এই যুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতি তার নীতিগত সমর্থনও আছে। কিন্তু যুদ্ধে যদি অংশ গ্রহণ করতে হয়, তবে ভারতবাসী তা নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচিতেই করবে—বৃটিশ সরকারের ইঙ্গিতে বা নির্দেশে নয়। এই নিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ বাধলো।

এই বিরোধের ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি ত্যাগ করলো। দেশে আবার রাজনৈতিক অচল অবস্থা দেখা দিলো। কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি ত্যাগ করায় মুসলিম লীগ 'মুক্তি দিবস' পালন করলো—অর্থাৎ ভারতের মুসলমানরা নাকি হিন্দুদের অবিচার ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেলো। তারা এখন মুসলিম-প্রধান এলাকা নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবীও তুললো।

ভারতীয় রাজনীতি ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠলো। এদিকে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিলো। গোড়ার দিকে জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েট

ইউনিয়ন মিত্রতার চুক্তি করলেও জার্মানি হঠাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করলো। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিলো। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে। জাপান দ্রুতগতিতে এগিয়ে ব্রহ্মদেশে এসে পৌঁছলো। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারত ছেড়ে গোপনে পালিয়ে গিয়ে জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি জাপানের সাহায্যে ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার সংকল্প নিলেন। জাপ বাহিনী ও সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছলো। ভারত যাতে এশিয়ায় প্রধান রণাঙ্গন না হয়ে ওঠে, সেজন্যে কংগ্রেস অবিলম্বে ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালো। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস গান্ধীজীর বিখ্যাত 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী-প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কারারুদ্ধ হলেন। জওহরলাল বন্দী হয়ে তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আটক রইলেন আহ্মদনগর দুর্গে। এই বন্দিদশাতেই জওহরলাল তাঁর "ভারত আবিষ্কার" নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

নেতাদের বন্দী হওয়ার সংবাদে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। দেশের বহু স্থানে হাঙ্গামা দেখা দিল। এই হাঙ্গামা বিদ্রোহের আকার গ্রহণ করলো। ইংরেজ সরকার কঠোরহস্তে এই বিদ্রোহ দমন করলেও তারা কংগ্রেসের

সঙ্গে একটা মিটমাটের চেষ্টা করলো। স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না থাকায় তা ব্যর্থ হ'ল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু যুদ্ধে ইংরেজরাই জয়ী হ'লো। যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হ'লে, তাতে ইংলণ্ডের শ্রমিক দল শাসন-ক্ষমতা পেল। শ্রমিক দল ভারত সম্পর্কে কিছুটা উদার নীতি গ্রহণ করলো। কংগ্রেস নেতারা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। জওহরলালকে আহ্‌মদনগর দুর্গ থেকে নৈনি জেলে আনা হ'লো। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো বেরিলি জেলে, বেরিলি জেল থেকে আলমোড়া জেলে। সেখান থেকেই ১৯৪৫ সালে তিনি অবশেষে মুক্তি পেলেন। এইটিই তাঁর জীবনের শেষ কারাবাস ও দীর্ঘতম কারাবাস।

ভারতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যদের বিচার শুরু করলো ইংরেজ সরকার। বিচার চললো লাল কেল্লায়। এইসব বন্দী সৈনিক বীরের সম্মানে দেশবাসীর কাছে অভ্যর্থনা পেল। জওহরলাল সুদীর্ঘকাল পরে ব্যারিষ্টারের পোশাকে এইসব দেশপ্রেমিক সৈনিকদের সমর্থনে আদালতে উপস্থিত হলেন। তিনি এদের জন্য তহবিল গড়ে তুললেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকরা মুক্তি পেল।

এবার ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতেও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লো। এই নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ আসনগুলিতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলো।

মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে মুসলিম লীগ অধিকসংখ্যক আসন পেলেও কংগ্রেস তাতেও অনেক আসন পেল। এই সময় ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল। ভারতীয় স্থল বাহিনী ও বিমান বাহিনীতে ঝড়ের লক্ষণ প্রকাশ পেল। বৃটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ভারতে বৃটিশ মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে পাঠালো। মুসলীম লীগ ভারতবর্ষকে দু টুকরো ক'রে মুসলিমপ্রধান অংশ নিয়ে পৃথক পাকিস্তান গঠনের দাবী করলো। মন্ত্রী মিশন মুসলিম লীগের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে ভারতে একটি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। তবে এই পরিকল্পনায় হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকে 'ক' শ্রেণীতে, মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলিকে 'খ' শ্রেণীতে আর বাংলা ও আসামকে 'গ' শ্রেণীতে ফেলা হ'লো। ঐ সকল বিভিন্ন শ্রেণীকে পরে নিজের ইচ্ছামতো অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে একত্র থাকবার বা তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হ'লো। এর মধ্যে পাকিস্তানের কিছুটা সম্ভাবনা দেখে মুসলিম লীগ রাজী হ'লো। ভারতের জন্য একটি অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যবস্থা হ'লো। কিন্তু মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে সকল মুসলিম মন্ত্রী নিয়োগের অধিকার দাবী করলো। কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রতিষ্ঠান। তাই কংগ্রেস এই দাবী মেনে নিতে পারলো না।

১৯৪০ সাল থেকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন

স্থগিত ছিল। এখন কংগ্রেসের সভাপতি হলেন জওহরলাল নেহেরু। জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার এক মাস বাদেই বড়লাট তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো এবং ১৬ই আগস্টকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিবস ব'লে ঘোষণা করলো। এই সংগ্রাম বৃটিশের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল ভারতের হিন্দু ও অমুসলমানদের বিরুদ্ধে। ১৫ই আগস্ট জওহরলাল মিঃ জিন্নার সঙ্গে বোম্বাইয়ে দেখা করলেন। মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হলো। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে মুসলিম লীগ কলকাতায় ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধালো। এই দাঙ্গায় কলকাতায় প্রায় চার হাজার লোক মরলো ও বহু হাজার লোক আহত হ'লো। বহু দোকানপাট লুঠ হ'লো, বহু মন্দির-মসজিদ অপবিত্র হ'লো, বহু বাড়ি পুড়ে ছাই হ'লো। অক্টোবর মাসে আবার নোয়াখালিতে এবং বিহারের নানাজায়গায় ঐরকম নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটলো।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মন্ত্রী রূপে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন জওহরলাল। তিনি দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা চাইলেন, তিনি মুসলিম লীগকেও সরকারে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালেন। শেষ পর্যন্ত

মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখে মন্ত্রিসভা নূতন ক'রে গড়া হ'লো। কিন্তু মুসলিম লীগ তার পাকিস্তানের দাবী ছাড়লো না। মুসলিম লীগ গণ-পরিষদ ত্যাগ করার জন্য সকল লীগ সদস্যকে নির্দেশ দিলো। জওহরলাল তার জবাবে জানিয়ে দিলেন, মুসলিম লীগ গণ-পরিষদ বর্জন করলেও গণ-পরিষদের অধিবেশন চলতে থাকবে।

এখন মুসলিম লীগের অনুপস্থিতিতেই গণ-পরিষদের অধিবেশন শুরু হ'লো। মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে ব'লে ঘোষণা করবার দাবী জানালো এবং গণ-পরিষদ ভেঙে দিতে বললো। কংগ্রেসও বললো, মুসলিম লীগ যদি গণ-পরিষদ বর্জন করে, তবে মুসলিম লীগ সরকার থেকেও বেরিয়ে যাক্। এই রকম যখন অবস্থা, তখন বৃটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে, এই কথা ঘোষণা করলো। মুসলিম লীগ আর স্থির থাকতে পারলো না। মুসলিম লীগ পাকিস্তান আদায়ের উদ্দেশে পাঞ্জাবে দাঙ্গা বাধালো।

এই দাঙ্গার চেহারা দেখে সকলেই ভয় পেলেন। ভারত যে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন, এমন কথা অনেকেরই মনে হ'লো। ইতিমধ্যে লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেছিলেন। আগে থেকেই জওহরলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এখন তা আরও নিবিড় হ'লো। ভারতের এই রাজনৈতিক অবস্থায় সকলেই উদ্‌বিগ্ন

হলেন। শেষ পর্যন্ত এই ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কংগ্রেসও ভারত বিভাগ মেনে নিলো। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ, বাংলাদেশের পূর্ব অংশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হ'লো। বৃটিশ সরকারও আইন ক'রে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারতকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করলো। ভারত স্বাধীনতা পেলো।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হলেন জওহরলাল।



রাষ্ট্রনায়ক জওহরলাল

১৪ই আগস্ট মধ্য রাত্রিতে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শুভ ১৫ই আগস্ট তারিখটি এলো এবং ভারত লাভ করলো তার বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা। এখনকার সংসদ ভবনে জওহরলাল বললেন, "বহু বৎসর পূর্বে আমরা নিয়তির সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম—এখন সেই অঙ্গীকার পরিপূর্ণরূপে না হ'লেও যথেষ্টরূপে পূরণ

করবার সময় এসেছে।...আমরা এই স্বাধীন ভারতের এক সুমহান্ সৌধ গড়ে তুলবো, যাতে ভারতসন্তানরা সকলে বাস করতে পারবে।" সকালে জওহরলাল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করলেন। স্বাধীন ভারত বৃটিশের বিরুদ্ধে সকল বিদ্বেষের অবসান ঘটালো। তারই চিহ্নরূপে বৃটিশ ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকেই স্বাধীন ভারতের প্রথম বড়লাট হ'তে আহ্বান জানানো হ'লো।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য গত দুই শতাব্দী ধ'রে অসংখ্য মানুষ সংগ্রাম করেছে। জওহরলালও নিজে কঠোর সংগ্রাম করেছেন ত্রিশ বৎসর ধ'রে। আজ সেই স্বাধীনতা এসেছে।

শুধু স্বাধীনতাই আসে নি, এসেছে অসংখ্য দায়িত্ব, অসংখ্য সমস্যা। ভারতের স্বাধীনতা শুধু আনন্দই বয়ে আনে নি, এনেছে কতো চোখের জল, এনেছে ভারত বিভাগ। ভারত বিভক্ত হ'লেই মুসলিম লীগের ক্ষুধা মিটবে, হিন্দু-মুসলমান আবার ভারতে ও পাকিস্তানে ভাই ভাই হয়ে বাস করবে—দেশ-নেতাদের এই স্বপ্ন দুদিনে ভেঙে গেল। সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ-বিষের সঙ্গে জুঝতে হচ্ছে আজও—জুঝতে হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে। এই সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষের অনলেই বলিপ্রদত্ত হলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। ১৯৪৮ সালের ৩০শে

জানুয়ারি তারিখে এক হিন্দুর গুলিতেই তিনি নিহত হলেন। সেদিন জওহরলাল শোকে কাতর হয়ে বলেছিলেন ঃ "আমাদের জীবন থেকে আলো নিবে গেছে, সর্বত্রই শুধু অন্ধকার।" সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন, "আলো নিবে গেছে, একথা আমি বলেছি ; এতে আমি কিছু ভুলও বলেছি। আমাদের এই দেশে যে আলো জ্বলেছিল, তা কোনও সামান্য আলো ছিল না। যে আলো বহু বহু বৎসর ধ'রে এই দেশকে আলোকিত করেছে, সেই আলো আরও বহু বৎসর ধ'রে এই দেশকে আলোকিত করবে। হাজার হাজার বছর পরেও এই দেশে সেই আলো দেখা যাবে এবং বিশ্ব তা দেখবে, তা অগণিত হৃদয়ে শান্তির বাণী বয়ে আনবে।"

গান্ধীজীর মৃত্যু জওহরলালের জীবনে ছিল প্রচণ্ডতম আঘাত। কারণ, গান্ধীজী কেবল তাঁর কাছে রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, ছিলেন গুরু, পথপ্রদর্শক, পরামর্শ-দাতা, শক্তিদাতা। জীবনের গভীরতম নৈরাশ্যে, দুঃসহতম বেদনায় বাপুজীর বাণীই তাঁকে দিয়েছে আশার আলো, দিয়েছে সহনের শক্তি। জওহরলাল গান্ধীজীর অন্ধ ভক্ত ছিলেন না ; অনেক সময় ঘোর মতপার্থক্য ঘটতো তাঁদের। তবু গান্ধীজী জওহরলালকেই তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নির্বাচিত ক'রে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আমি যখন থাকব না, তখন সে আমারই

ভাষায় কথা বলবে।" গান্ধীজীর এই বিশ্বাস মিথ্যা হয় নি।

জওহরলালের ছিল কণ্টক-মুকুট। এই মুকুট তিনি সানন্দেই মাথায় পরেছিলেন। ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল সত্য, কিন্তু তার সংগ্রাম তো শেষ হয় নি। এই সংগ্রাম দারিদ্র্যের সঙ্গে, অনগ্রসরতার সঙ্গে, অশিক্ষার সঙ্গে, অস্বাস্থ্যের সঙ্গে, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে, প্রাদেশিকতার সঙ্গে। এই সংগ্রামে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জওহরলাল।

ভারতে প্রায় ছ'শো দেশীয় রাজ্য ছিল। সেগুলিতে তিনি ভারতের সার্বভৌমত্ব স্থাপন করেছিলেন। জুনাগড়, হায়দরাবাদ রাজ্য এই সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করলে তিনি বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হলেন না। কাশ্মীর পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ভারতে যোগ দিলে কাশ্মীর রক্ষার দায়িত্ব তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রভাবেই ফরাসীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে এদেশ ত্যাগ করলো। পর্তুগীজরা তাতে সম্মত না হ'লে তিনি তাদের বিতাড়িত করতে কুণ্ঠিত হলেন না।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার কিছুমাত্র ছিল না তাঁর মধ্যে। তাই যেখানেই তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার দুর্লক্ষণ দেখেছেন, সেখানেই তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। তাই ভারতকে তিনি ক'রে তুলেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ

রাষ্ট্র। কেবল তাই নয়, ভারতকে তিনি ক'রে তুলেছিলেন পৃথিবীর একটি সুবৃহৎ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই গণ-পরিষদ ভারতের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান রচনায় ব্যস্ত ছিল। ঐ সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারতে চালু হ'লো। ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নরনারীই পেলো ভোটাধিকার, পেলো ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা।

ভারতের অনগ্রসরতা দূর করবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন। ভারত যখন স্বাধীনতা পায় নি, তখনই তিনি পরিকল্পনা কমিশন গ'ড়ে তুলেছিলেন এবং কিভাবে ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন করা যায়, যে সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন। তারই ফল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হ'লো, জওহরলাল নিজে হলেন এই কমিশনের সভাপতি। পনের মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী রচনা করলো। তারপর দেশে একের পর একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি কি অর্থনীতি, কি শিক্ষা, কি সংস্কৃতি, কি স্বাস্থ্য, সকল দিক থেকেই দেশকে অগ্রসর ক'রে তুলেছে। দেশে অসংখ্য

কলকারখানা, পথঘাট, বাঁধ, জলাধার, সেচ ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল গড়ে উঠেছে।

এজন্যে প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র দেশে রাতারাতি এতো অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তাই বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হ'লো। কেবল তাই নয়, বিদেশী মূলধন, বিদেশী যন্ত্রপাতি ও বিদেশী বিশেজ্ঞদের সাহায্য দরকার হ'লো। জওহরলালের নিপুণ পররাষ্ট্র নীতি তা সম্ভব করলো। যাতে পৃথিবীর সকল দেশ থেকেই ভারত সাহায্য ও সৌহার্দ্য পেতে পারে, সেজন্যে তিনি কমিউনিস্ট বা অকমিউনিস্ট কোনও জোটের সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করলেন না। তিনি কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে স্থাপন করলেন সমান বন্ধুত্ব। যাতে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট দেশগুলি পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেজন্য তিনি গ্রহণ করলেন সহাবস্থানের উদার নীতি। কোনও যুদ্ধ ঘটলে ভারতে বৈদেশিক সাহায্য ব্যাহত হবে। ভারত যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে তার অর্থনীতি বিপন্ন হবে, সেজন্যেও তিনি ছিলেন যুদ্ধের বিরোধী ও শান্তির পূজারী। এইভাবে জওহরলাল পররাষ্ট্র নীতিতে জোটনিরপেক্ষতা, সহাবস্থান ও শান্তির আদর্শকেই সর্বোচ্চে স্থান দিলেন।

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিই দীর্ঘকাল ধরে

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছিল। ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি আজ দুর্বল ও শক্তিহীন, দরিদ্র ও অসমৃদ্ধ। তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে; তারা উন্নত ও সমৃদ্ধ হ'তে চেষ্টা করছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তাতে ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করছে। তাই জওহরলাল ছিলেন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাসী। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে কোনও দেশ যখনই সংগ্রাম করেছে বা স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাকে জওহরলাল সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এশিয়া ও আফ্রিকার ঐক্য ও সংহতি সাধনের জন্য তিনি নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীনের সঙ্গে এজন্য নিবিড় বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। ভারত ও চীনের চেষ্টায় ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রধান দেশগুলির প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চশীলের নীতি। এই পঞ্চশীলে বলা হয়েছিল, প্রত্যেক দেশ অপর দেশের ভৌম অখণ্ডতা ও সার্বভৌমতা মেনে চলবে; কোনও দেশ কাউকে আক্রমণ করবে না; কোনও দেশ অন্য কোনও দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না; পরস্পরকে সমান চক্ষে দেখবে; শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অর্থ নৈতিক সহযোগিতার নীতি মেনে চলবে। চীন পরে পঞ্চশীল থেকে বিচ্যুত হয়েছে, ভারতকে আক্রমণ

করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করছে; শান্তি, সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতিকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু ভারত বান্দুং সম্মেলনে ঘোষিত পঞ্চশীলের নীতি থেকে শত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও বিচ্যুত হয় নি।

ভারত দীর্ঘদিন ইংরেজদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছিল। তাই বৃটিশবিদ্বেষ ছিল ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অহিংসার পূজারী জওহরলাল এই ধরনের বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেন নি। ভারত যাতে ইংলণ্ড ও বৃটিশ কমনওয়েল্থের বিভিন্ন দেশের সাহায্য ও সহানুভূতি পেতে পারে, সেজন্যে তিনি বৃটিশ কমনওয়েল্থের মধ্যে থাকতে রাজী হন। তবে এখন থেকে বৃটিশ কমনওয়েলথ হয়ে ওঠে কমনওয়েল্থ্ অফ নেশন্স্!

জওহরলাল চিরদিনই বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। বিশ্ব রাজনীতির গতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণরূপে সচেতন। তাই তিনি ভারতকে বিশ্ব রাষ্ট্র সংস্থার সক্রিয় সদস্যে পরিণত করেন। এই বিশ্ব সংস্থার ওপর তিনি যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তা অনেক রাষ্ট্রনেতাই করেন নি। বিশ্ব রাষ্ট্র সংস্থা প্রকৃত বিশ্ব সংস্থায় পরিণত হ'ক, বিশ্বের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখুক, এই ছিল তাঁর চিরন্তন কামনা। এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কমিউনিস্ট চানকে এই সংস্থায় স্থান দেওয়া

হয় নি। চীনের শত শত্রুতা সত্ত্বেও, এর বিরুদ্ধে জওহরলাল ক্রমাগত সংগ্রাম করেছেন। চীন বিশ্ব রাষ্ট্র সংস্থার সক্রিয় সদস্য হ'ক, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগী হয়ে উঠুক, এই ইচ্ছা তিনি আন্তরিকভাবে পোষণ করতেন।

দেশকে সমৃদ্ধ করাকেই জওহরলাল একমাত্র লক্ষ্যরূপে দেখেন নি। দেশের অগণিত সাধারণ মানুষও সেই সমৃদ্ধির ভাগ পাবে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, তারা পাবে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার সমান সুযোগ, এই ছিল জওহরলালের চিরকালের আদর্শ। তাই তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই সমাজতন্ত্র আসবে জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও অহিংস পথে, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে নয়, এই আদর্শেও তিনি অবিচল ছিলেন। তাই তিনি দেশে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে ব'লে বহুবার খেদ প্রকাশ করেছিলেন, কংগ্রেসকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এক সময় কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সমাজতন্ত্রের বিরোধী। তাঁদের বিরোধিতা তিনি রোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শকেই গ্রহণ করেছিল।

জওহরলাল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের নূতন সংবিধান অনুসারে ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যে নির্বাচনগুলি হয়েছিল,

সেগুলিতে কংগ্রেস বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল এবং জওহরলাল একাদিক্রমে মৃত্যু পর্যন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এ গৌরব গণতান্ত্রিক দেশে খুব সামান্যসংখ্যক নেতার কপালেই জুটেছে।

পাকিস্তান তার জন্ম-মুহূর্ত থেকেই ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করছে। কাশ্মীর আক্রমণ করেছে, সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে, সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আদানপ্রদান বন্ধ করেছে। নেহেরু শান্তিপূর্ণভাবেই এসব সমস্যার মীমাংসার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাই জওহরলালের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে পাকিস্তানের দিক্ থেকে খুব বড় রকমের কোনও বিপদ আসেনি।

কিন্তু ভারতের বড় বিপদ এসেছিল সম্পূর্ণ একটি অপ্রত্যাশিত দিক থেকে, যা জওহরলালকে জীবন-সায়াহ্নে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছিল, যা তাঁর জীবনের শেষ কটি বছরকে অস্থিরতায় ভরে দিয়েছিল। জওহরলাল চীনের প্রতি যৌবনকাল থেকে অনুরক্ত ছিলেন। কারণ, চীন ভারতের মতোই আর একটি সুপ্রাচীন সুমহান দেশ। ভারতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও হৃদ্যতাও সুপ্রাচীন কাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছিল। তাই নবজাগ্রত চীনের উপর যখন জাপান আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন ভারতের ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। চীনের কুয়োমিনৃতাং সরকারের প্রধান মার্শাল চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর পত্নী মাদাম চিয়াং

কাই-শেকের সঙ্গে জওহরলালের প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল। এ বন্ধন ব্যক্তিগত ছিল না, ছিল চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধন। তাই মার্শাল চিয়াং যখন চীনের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হলেন, তখন ফরমোসায় প্রতিষ্ঠিত তাঁর সরকারকে জওহরলাল স্বীকৃতি দেননি। জওহরলাল চীনের নূতন শাসক গোষ্ঠী কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব গ'ড়ে তুললেন।

ভারত কমিউনিস্ট চীনকে অন্যান্য বহু রাষ্ট্রের আগেই স্বীকৃতি দিল। চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন লাই এবং জওহরলালকে একযোগে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করতেও দেখা গেল। 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'—এই ধ্বনি এশিয়ার ঐক্য ও সংহতির ধ্বনি রূপে দেখা দিল। কিন্তু জওহরলালের আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা হঠাৎ আলেয়ার আলোয় পরিণত হ'লো। চীন পরদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগলো। কেবল তাই নয়, সে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করলো। ভারতের বহু হাজার মাইল ভূখণ্ডকে নিজের ব'লে দাবী ক'রেই সে ক্ষান্ত হ'লো না। মানচিত্রের যুদ্ধ পরিণত হ'লো সশস্ত্র যুদ্ধে। ১৯৬২ সালে চীন নির্লজ্জভাবে ভারত আক্রমণ করলো।

জওহরলাল তবু সমগ্র চীনা জাতিকে এজন্য অপরাধী করলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন, "চীনের সরকার

আমাদের আক্রমণ করেছে, আমরা তাদের প্রতিরোধ করবো।" মতবিরোধ ও সীমান্ত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও চীন যে ভারত আক্রমণ করতে পারে, তা ছিল জওহরলালের কল্পনারও অতীত। তাই চীনের বিরুদ্ধে ভারত সামরিক দিক্ থেকে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত বিপন্ন হ'লো। ভারতের এই বিপদে ভারতকে সাহায্যের জন্য পৃথিবীর বহু দেশ এগিয়ে এলো। বহু দেশ এই বিবাদ মীমাংসার জন্য সচেষ্ট হ'লো। ভারত নিজেও দ্রুত চীনাদের প্রতিরোধের জন্য রুখে দাঁড়ালো। ফলে চীনা বাহিনী নিজ থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ক'রে কিছুটা পিছু হটে গেল। তবু ভারতের অনেকখানি ভূখণ্ড তার দখলে রয়ে গেল। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের চেষ্টায় সিংহল, ব্রহ্ম, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র ও ঘানার রাষ্ট্রনায়করা চীন ও ভারতের বিরোধ মীমাংসার জন্য 'কলম্বো প্রস্তাব' দিলেন। ভারত এই প্রস্তাব মেনে নিলো। চীন প্রথমে মেনে নিলেও পরে নানারকম ব্যাখ্যার জাল বুনে নূতন মতবিরোধের সৃষ্টি করলো এবং ভারতের অনেকখানি ভূখণ্ড গ্রাস ক'রে বসে রইলো।

চীনের এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ জওহরলালের মধ্যে যে মানসিক সংকট সৃষ্টি করেছিল, তার আঘাত তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। একটি রাষ্ট্র, যার বন্ধুত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, তার এই আচরণ তাঁকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়

ক'রে দিয়েছিল। দেশেও তাঁর শান্তি, সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষ নীতির সমালোচনা কম হয় নি। তবু তিনি এই নীতিতেই অটল রইলেন। তিনি যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর ক'রে তুললেন, তেমনি দৃঢ়তর ক'রে তুললেন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব। তখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে চীনের প্রকাশ্য বিবাদ ঘটে নি। কিন্তু নেহেরু সম্ভবত বুঝেছিলেন, চান যে উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ করছে, তা প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক নীতি নয়, এই নীতির সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির বিরোধ অনিবার্য। তাঁর সে ধারনা মিথ্যা হয় নি। আজ চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বহু কমিউনিস্ট দেশের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছে।



মহাপ্রয়াণে জওহরলাল

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।" নেহেরুও তাই প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেননি। চির-তারুণ্যের প্রতীক এই মানুষটির মধ্যে বার্ধক্য গোপনে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু তাঁর মনে বিন্দুমাত্র বার্ধক্য ছিল না। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণরূপে কর্মচঞ্চল। সমস্যাসঙ্কুল ভারতের রাষ্ট্রতরণীর নিপুণ কর্ণধার ছিলেন তিনি।

নেহেরুজী সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নিয়মিত কাজ করতেন। তার মধ্যে ছিল ভাষণ দান, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা, দেশে-বিদেশে আতিথ্যরক্ষা, দেশ-দেশান্তরে ঝড়ের বেগে ভ্রমণ। রাজধানীতে রোজই প্রায় ১৮ ঘণ্টা কাজ করতেন তিনি। সাতজন সেক্রেটারি তাঁকে সাহায্য করতো। কর্মচারীরা কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়তো, কিন্তু ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিল না তাঁর বিন্দুমাত্র। তাঁর অসামান্য প্রাণশক্তি সকলকেই আশ্চর্য করতো। একটি বৃহৎ দেশ এবং একটি সুবৃহৎ পৃথিবী ছিল তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র। ছোটখাটো শারীরিক অসুস্থতা ও ক্লান্তিকে তিনি আমল দিতেন না। এইভাবে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল এই মানুষটি একটানা কাজ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এই একটানা কাজে ছেদ পড়লো। ১৯৬৪ সালে ভুবনেশ্বরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। এই অধিবেশনের জন্য তিনি এসেও ছিলেন। কিন্তু অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি।

অধিবেশনের আগের দিন, ৬ই জানুয়ারি তারিখে, নেহেরুজী টিকেরপাড়া থেকে হেলিকপ্টারে ক'রে ভুবনেশ্বরে এসে পোঁছলেন। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছিল। বিমান বন্দরে তিনি জাতীয় সেনানী বাহিনীর অভিবাদন নিতেও যেন কষ্ট বোধ করছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হ'লো, সন্ধ্যাতেও

তিনি কংগ্রেসের স্টিয়ারিং কমিটির অধিবেশনে যোগ দিলেন। পরদিন সকালেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের সকল আয়োজন যেন নায়কহীন নাটকে পরিণত হ'লো। জানানো হ'লো, প্রধান মন্ত্রী কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত কাজের চাপের মধ্যে কাটানোর ফলে তাঁর রক্তের চাপ খুব বেড়ে গেছে। চিকিৎসকরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। সমগ্র জাতি কয়েকদিন দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটালো। তারপর নেহেরুজী আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাদেই তিনি নিজে কাজে যোগ দিলেন। পরবর্তী তিন মাস বেশ ভালই কাটলো। নেহেরুজীর অসুস্থতার কথাও লোকে প্রায় ভুলে গেল। তিনি নিজেও ভুলে গেলেন। আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি মে মাসের গোড়াতে নেপাল সীমান্তে গণ্ডক বাঁধের উদ্বোধন করলেন। পরের সপ্তাহে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য বোম্বাই গেলেন। সেখান থেকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে গেলেন দেরাদুন। ২২শে মে রবিবার তিনি সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে হাসিমুখে বললেন, "শিগ্‌গির মরছি না।" ("My lifetime is not going to end so soon.") দেরাদুন থেকে তিনি দিল্লীতে ফিরে এলেন।

২৬শে মে রাত্রিতেও তিনি বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি তাঁর অভ্যাসমতো রাত এগারোটা পর্যন্ত কাগজপত্র

দেখলেন, টেবিলে জমা কাজ সব শেষ ক'রে রাখলেন। তিনি যখন শুতে গেলেন, তখনও কিছুমাত্র অসুস্থতা বা অস্বস্তি বোধ করেন নি। কিন্তু শেষ রাত্রিতে, ২৭শে মে ভোর চারটায়, তাঁর গা হঠাৎ বমি-বমি করতে লাগলো। তিনি এতে অভ্যাসমতো কোনরকম গুরুত্ব দিলেন না, ফের শুতে গেলেন। কিন্তু কোনমতে ঘুমুতে পারলেন না, একটা তীব্র অস্বস্তি ও পিঠে যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলেন।

সকাল ছটায় তাঁর পিঠের ব্যথা খুবই বাড়লো, তিনি চাকরকে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কন্যা ইন্দিরাও উঠে এলেন। অবিলম্বে ডাক্তাররা এসে পৌঁছলেন। তাঁরা দেখলেন, রক্তের চাপ হঠাৎ খুব কমে গেছে। নেহেরুজীও খুব দুর্বল বোধ করছেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ডাক্তাররা নেহেরুজীর রক্তের চাপ বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। নেহেরুজী কিন্তু এই অবস্থাতেও রোগকে গুরুত্ব দিলেন না। তিনি কারো সাহায্য না নিয়েই একা স্নানের ঘরে গেলেন। যাওয়ার এই চেষ্টাতেই সর্বনাশ ঘটলো। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন।

তাঁর এই অচেতন অবস্থা আর কাটে নি। কেবল মুহূর্তের জন্য একবার তিনি চোখ মেলে চাইলেন, কাকে যেন খুঁজলেন, তাঁর চোখদুটি কন্যার উপর পড়লে কি যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। পর মুহূর্তে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। আরও কয়েক ঘণ্টা



অচৈতন্য অবস্থায় কাটলো। অবশেষে বেলা ১টা ৫৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এইভাবে এই চিরসংগ্রামী মানুষটির চির সংগ্রামের অবসান হ'লো।

এই সংবাদ যখন বেতারে করুণ আর্তনাদের মতো ঘোষিত হ'লো, তখন সারা ভারত এক গভীর দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লো, দেশ দেশান্তরে এই বার্তা রটে গেল। সর্বত্রই এই মহান্ নেতার মহাপ্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া পড়লো। ১২ দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় শোক পালনের নির্দেশ দেওয়া হ'লো। পরদিন শবদাহের দিন স্থির হ'লো। রাজধানীর সকল পথ নেহেরুজীর বাসভবন তিনমূর্তি ভবনের দিকে প্রসারিত হ'লো। লক্ষ লক্ষ মানুষ চললো তাদের মহান্ নেতাকে শেষ প্রণাম জানাতে।

সে ছিল ঝড়বৃষ্টির রাত্রি। ভারতের আকাশেও দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে, একি তারই ইঙ্গিত? না, এ ছিল প্রকৃতির অশ্রুবর্ষণ ও হাহাকারে ভরা দীর্ঘশ্বাস? লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝড়বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে তিনমূর্তি ভবনের সামনে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

বেলা একটার সময় নেহেরুজীর শবদেহ সুসজ্জিত কামানবাহী শকটে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো যমুনার তীরে যেখানে গান্ধীজী অনন্তশয়ানে শায়িত আছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্মভেদী "জওহরলাল নেহেরু অমর রহে" ধ্বনির মধ্যে তিনমূর্তি ভবন থেকে যমুনাতীর

পর্যন্ত ছ'মাইল দীর্ঘ পথ শববাহী শকটটি বিরাট শোভাযাত্রা সহ আনীত হ'লো। বিভিন্ন ধর্মের মন্ত্রগাথা ধ্বনিত হ'তে লাগলো। জনতার 'জওহরলাল নেহেরু অমর রহে' মিলিত হ'লো তার সাথে। দৌহিত্র সঞ্জীব মুখাগ্নি করলেন। নেহেরুজীর মরদেহ চিতাভস্মে বিলীন হ'লো।

৮ই জুন তারিখে নেহেরুজীর কিছু চিতাভস্ম এলাহাবাদে ত্রিবেণীসংগমে গঙ্গায় ফেলা হ'লো। বাকী চিতাভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হ'লো বিমান থেকে ভারতের সর্বত্র, পর্বতে, অরণ্যে, কৃষিক্ষেত্রে, নগরে, গ্রামে, জনপদে। নেহেরুজীর নশ্বর দেহের দেহাবশেষ মিশে গেল ভারতের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে। ভারতমায়ের প্রিয় সন্তান ফিরে গেলেন মায়ের কোলে।

জওহরলালের জীবনপঞ্জী

১৮৮৯—১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে জন্ম

১৯০৫—বিলাত যাত্রা, হ্যারো পাবলিক স্কুলে প্রবেশ

১৯০৭—কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ

১৯০৯—জার্মানি ও ফ্রান্স ভ্রমণ

১৯১০—বিজ্ঞানে ট্রাইপস লাভ

১৯১২—ব্যারিস্টার হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন; এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইনজীবীরূপে যোগদান; বাঁকিপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান

১৯১৩—উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান

১৯১৬—কমলার সঙ্গে বিবাহ

১৯১৭—কন্যা ইন্দিরার জন্ম

১৯১৮—নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ লাভ

১৯২০—প্রতাপগড়ে প্রথম কৃষক বিক্ষোভ সংগঠন

১৯২১—৬ই ডিসেম্বর, প্রথম কারাবাস

১৯২২—কারাগার থেকে মুক্তিলাভ; পুনরায় কারাবাস

১৯২৩—কারাগার থেকে মুক্তিলাভ; নাভাদেশীয় রাজ্যে গ্রেপ্তার ও হাজতবাস; নাভা জেল থেকে মুক্তিলাভ; এলাহাবাদে পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত; সেপ্টেম্বর, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত

১৯২৫—এলাহাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ; কমলা নেহেরুর কঠিন পীড়া

১৯২৬—কমলার চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা; ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম ও রাশিয়া সফর

১৯২৭—ব্রুসেল্‌সে নির্যাতিত জাতিসমূহের সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগদান; মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতা-প্রস্তাব গ্রহণ করানোর ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ

১৯২৮—সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন—লখ্‌নৌয়ে পুলিসের আক্রমণে আহত; ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লীগের (ভারতের জন্য স্বাধীনতা সংঘ) প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ

১৯২৯—কংগ্রেসের সভাপতি পদ লাভ; লাহোর কংগ্রেসে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা

১৯৩০—আইন অমান্য আন্দোলন—গ্রেপ্তার ও কারাবাস; কারাগার থেকে মুক্তিলাভ; পুনরায় গ্রেপ্তার ও কারাবাস

১৯৩১—কারাগার থেকে মুক্তিলাভ; পিতা মতিলালের মৃত্যু; পুনরায় গ্রেপ্তার ও কারাবাস

১৯৩৩—মাতার অসুস্থতার কারণে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ

১৯৩৪—বিহার ভূমিকম্পের জন্য ত্রাণ তহবিল গঠন; কলকাতায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতাদানের জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবাস; রুগ্ণা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দশদিনের জন্য মুক্তিলাভ

১৯৩৫—আলমোড়া জেলে আত্মজীবনী গ্রন্থ রচনা শেষ; রুগ্ণা স্ত্রীকে দেখবার জন্য ইউরোপ যাত্রা

১৯৩৬—কমলার মৃত্যু; লখনৌ কংগ্রেসে সভাপতি; নির্বাচনী অভিযান; ফৈজপুরে কংগ্রেসে সভাপতিত্ব

১৯৩৮—মাতা স্বরূপরানীর মৃত্যু; স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি সফর

১৯৩৯—চীন সফর

১৯৪০—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ; চার বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত

১৯৪১—ডিসেম্বর মাসে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মুক্তিলাভ

১৯৪২—৭ই আগস্ট তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব উত্থাপন; ৮ই আগস্ট গ্রেপ্তার ও আহ্মদনগর দুর্গে আটক—শেষ ও দীর্ঘতম কারাবাস

১৯৪৫—জানুয়ারি মাসে মুক্তিলাভ ; বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা ; আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যদের সমর্থন

১৯৪৬—ভারত বিভাগের বিরোধিতা ; পূর্ব এশিয়া সফর ; চতুর্থবারের জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ ; ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার গঠন—প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ ; বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য লণ্ডন গমন

১৯৪৭—১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ ; স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ ; বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব

১৯৪৮—৩রা নভেম্বর, প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দান

১৯৪৯—আমেরিকা ভ্রমণ ; ১৩ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ভাষণ ; ২৪শে অক্টোবর কানাডার সংসদে ভাষণ

১৯৫০—সুপ্রীম কোর্টের উদ্বোধন ; পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও সভাপতির পদ গ্রহণ ; নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তি ; করাচী সফর

১৯৫১—কায়রো, জেনেভা, লণ্ডন ও প্যারিস সফর ; নেপাল সফর ; কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত

১৯৫৩—রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেকে যোগদানের জন্য লণ্ডন গমন ; করাচী সফর

১৯৫৪—সিংহল সফর ; চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন্-লাইয়ের দিল্লী আগমন—চৌ-এন্-লাইয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ; চীন সফর ; ব্রহ্মদেশ, সিয়াম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয় সফর

১৯৫৫—ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে যোগদান ও 'পঞ্চশীল' নীতি ঘোষণা ; সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালি ও মিশর সফর ; 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ ; বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ সংবর্ধনা

১৯৫৬—আয়ারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, মিশর, সিরিয়া, লেবানন সফর ; দিল্লীতে চৌ-এন্-লাইয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপ সফর ; রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ভাষণ দান

১৯৫৭—সিরিয়া, ডেনমার্ক, ফিন্ল্যাণ্ড, নরোয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, মিশর, সুদান, জাপান সফর

১৯৫৮—চেকোশ্লোভাকিয়া ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোর সঙ্গে আলোচনা ; প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ ; ভুটান সফর

১৯৫৯—তিব্বতে হাঙ্গামা সম্পর্কে সংসদে ভাষণ ; নেপাল, আফগানিস্থান ও ইরান সফর ; ব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট নে উইনের সঙ্গে আলোচনা ; আয়ুব খাঁর সঙ্গে আলোচনা

১৯৬০—লণ্ডন, প্যারিস, মিশর, তুরস্ক ও লেবানন সফর; রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দান

১৯৬১—বেলগ্রেডে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের প্রথম সম্মেলনের উদ্বোধন; সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ব্রেজনেভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১৯৬২—তৃতীয়বার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ; চীনা আক্রমণে দেশবাসীকে নেতৃত্ব দান

১৯৬৪—জানুয়ারি, কংগ্রেসের ভুবনেশ্বর অধিবেশনে যোগদান-কালে হঠাৎ অসুস্থতা, ২৭শে মে পরলোক গমন

ভারতরত্ন জওহরলাল

ওরিয়েণ্ট বুক কো
কলিকাতা-১২

